UNICAL
ইউনিক্যাল

শারদ প্রস্তুতি ও ঈদের উৎসবের ছবি ধরা পড়েছে প্রসূন মণ্ডলের ক্যামেরায়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | Not for sale

২০২১-২৩
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপণ বিভাগ
স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ,
চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের
তৈরি ল্যাব জার্নাল

প্রতি মাসের কিছু বিশেষ দিন চলে যায় নজরের আড়ালে। তেমনই সেপ্টেম্বর। ২ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নারকেল দিবস। প্রতি সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় শনিবার বিশ্ব প্রাথমিক চিকিৎসা দিবস। বিশ্ব ওজোন দিবস ১৬ সেপ্টেম্বর। বিশ্ব গন্ডার দিবস ২২ সেপ্টেম্বর। প্রতি সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবার বিশ্ব নদী দিবস।

রবিকবির কলমে সেদিন বাঁধা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব থিম সংগীত

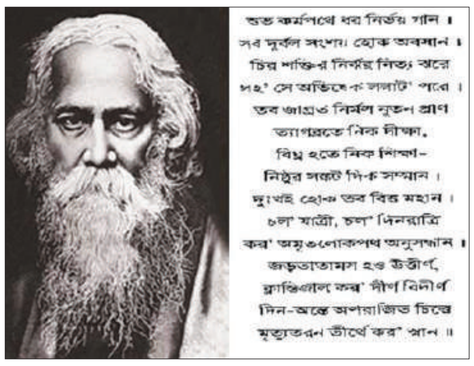

সাক্ষী গাঁতাইত

রবিকবির বেশ কিছু রচনা তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে নেওয়া হয়েছে। উপাচার্য তখন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গবাসী পত্রিকায় লেখালেখির সূত্রে কবির সঙ্গে পরিচয়। ১৯৩৪ সালের ৮ আগস্ট উপাচার্য হওয়ার কয়েক বছর পর, শ্যামাপ্রসাদ ঠিক করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সেই বছর অন্যভাবে পালন করবেন। আয়োজন করা হবে শোভাযাত্রার। এই শোভাযাত্রায় কুচকাওয়াজের সঙ্গে প্রয়োজন ছিল একটি মার্চ সং-এর। এই ভেবে উপাচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন প্রতিষ্ঠা দিবসে গাওয়ার উপযোগী একটি গান লিখে দিতে। রবি ঠাকুর অবশ্য সেই অনুরোধ রেখে একটির বদলে দু'টি গান রচনা করেছিলেন। প্রথমটি হল "চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই" এবং দ্বিতীয়টি "শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান"। এর মধ্যে প্রথম গানটি প্রতিষ্ঠা দিবসের জন্য নির্বাচিত হয়। কিছুদিন

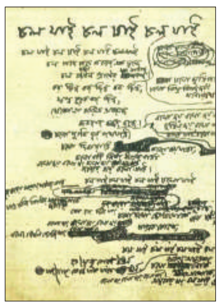

শান্তিনিকেতনে মহড়াও চলে। তবে এই গান চালু হয়নি। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট শতবর্ষ-পরবর্তী সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে "শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান"-টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গান হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ... পৃ. ৭

Senate House symbolises *150th* education renaissance

Samrat Chakraborty

Senate Hall, the element which changed the landscape of the educational hub of the 'City of Joy' not only for its neo clanical style but also for its various historic moments of University of Calcutta has turned its age of 150 years. If the cleath bell was not many in 1960, CU would never loose to commemorate this national event with grandeur. This is the only hall which became the signature building of this University and in its culinary years in 1957, India Govermunt also acknowledged. thus academie institution by issuing a postal stamp on this hall. However it is to be mentioned that distinct Greek limfile facade type structure was completed in six years building and finally on March 12, 1873 the then new building was opened by vice-chancellor E C Bayley mentioning that hall as visible embodiment. The decision to construct a dedicated building for the university was made in 1862. The masterpiece, designed by the... P7

Enhancement of moral education was their motto

Sayantika Dutta

In 1854 a dispatch was sent to the Governor General of India by the court of directors of the East India company, suggesting to establish universities in Calcutta, Madras and Bombay. As the response, in 1857 the University of Calcutta was founded. Sir James William Colvile was appointed as the first vice chancellor of the university and he served the office till 1859. And it took more than three long decades before an Indian was appointed as the vice chancellor of the university. Sir Gooroo Dass Banerjee became the first Indian vice chancellor of Calcutta University after he took office on 1st January 1890 and served there till 31st December 1892.

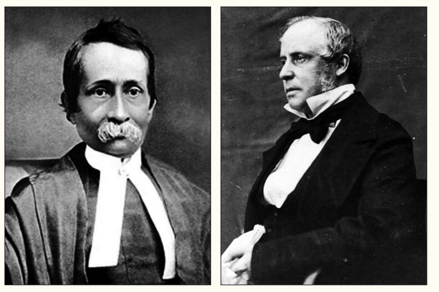

First VC and the first Indian VC

Colvile, by birth a Scottish received his education from prestigious institutions like - Elton college, Trinity College and Cambridge University. He was appointed by the East India company as their advocate general and that brought him to Calcutta. When he was appointed as the vice chancellor of the University of Calcutta... P7

বিজ্ঞান সাংবাদিকতা: ইসনা-র গর্বের ৮৮...

টিম ইউনিক্যাল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ। দেশের চার দিকপাল বাঙালি বিজ্ঞানী বসে রয়েছেন একতলার একটি আলোআঁধারি ঘরে। বিজ্ঞান আর দর্শনের তত্ত্বকে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাথ সাহা, বিধুভূষণ রায় এবং নিখিল রঞ্জন সেন। বিজ্ঞানের খবর ছাড়া দেশের অগ্রগতি যে অসম্ভব— তা বুঝতে পেরেই ১৯৩৫ সালে কলকাতায় জন্ম নিল বিজ্ঞানের খবরের প্রথম দেশীয় সংগঠন— ইন্ডিয়ান সাইন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ইসনা) । সেইসঙ্গে সংগঠনের একটি দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা— 'Science and Culture'। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ থেকে ওই সংগঠন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান মন্ত্রকের

প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে বিজ্ঞান সাংবাদিকতার ট্রেনিং পাঠক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের কে কে না এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন! পূর্বে উল্লেখিত ব্যক্তিত্বরা ছাড়াও নানা সময়ে কলকাতার এই সংগঠনে যুক্ত ছিলেন ডা: উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ড. বীরেশ গুহ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, আত্মা রাম, হোমি জাহাঙ্গির ভাবা, প্রিয়দারঞ্জন রায়, টি আর শেষাদ্রি, দেবেন্দ্রমোহন বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রমুখ বিজ্ঞানী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মত রাষ্ট্রনায়ক। সংগঠনের এই জার্নাল নানা সময়ে ড. অটোহান, ড. জেবিএস হ্যালডেন, স্যার আর্থার এডিংটন, ড. এফ কে মরিসের মত বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের লেখাতেও সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা এই সংগঠনের বিজ্ঞান সাংবাদিকতার পাঠক্রম যথেষ্ট জনপ্রিয়।

ছৌ মুখোশে বর্ণময় শিল্পের ধারাবিবরণী

দীপশুভ্রা মাহাতো

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা আমরা নাচের মাধ্যমে বা নাটকের মাধ্যমে দেখেই থাকি কিন্তু নাচ -নাটক -মার্শাল আর্ট – জিমনাস্টিকস সব মিলে একাকার হয়ে মিলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরানের ঘটনা দেখতে পাই আমরা ছৌ এর আসরে (যেমন – মহিষাসুর মর্দিনী, কংস বধ, অভিমন্যু বধ প্রভৃতি)। পূর্ব ভারতের ঐতিহ্যশালী এই লোকনৃত্যকে আমরা তিন ধরনের মোড়কে দেখতে পাই, ওড়িশার 'ময়ূরভঞ্জ ছৌ', ঝাড়খণ্ডের 'শিরাইকেল্লা ছৌ' এবং পশ্চিমবঙ্গের 'পুরুলিয়াশৈলী ছৌ'। ২০১০ সালে ইউনেসকো এই মুখোশনৃত্যকে 'ইন্টেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি' তালিকাভুক্ত করে। ঐতিহ্যবাহী এই নৃত্য পূর্ব ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইউনেসকোর হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পরে সারাবিশ্ব জুড়ে এ নৃত্য সমাদৃত। শিল্পীদের সুনিপুণ শৈল্পিক প্রতিভা, শারীরিক কসরত ভিত্তিক অঙ্গভঙ্গি, পরম্পরাগত মুখোশ এবং সুসজ্জিত পোশাকের ব্যবহার পুরুলিয়া ছৌ নাচকে যেন এক অনন্য মাত্রা এনে দেয়।

'পুরুলিয়াশৈলী ছৌ' এ নাচকে এক বিশেষ মাত্রায় আকৃষ্ট করে তোলে মুখোশের ব্যবহার। তৈরির পদ্ধতিটিও বেশ আকর্ষণীয়। প্রথমেই একটি ছাঁচ তৈরি করা হয় তারপর সেই ছাঁচের উপরে একাধিকবার (২-৩ বার)কাগজ এবং আঠার প্রলেপ দেওয়া হয়। তার ওপরে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় এবং পুরোনো কাপড়ও তার সঙ্গ দেয়। তার ওপরে আবার দেওয়া হয় মাটির প্রলেপ। মাটির লেপ দেওয়া মুখোশকে শুকোতে দেওয়া হয়, আর তারপরে তাতে প্রাণ ঢালতে দেওয়া হয় তুলির টানে, প্রাকৃতিক রঙের ছটা। এরপর এই মুখোশকে শেষ সাজে সাজিয়ে তুলতে পাখির পালক (যেমন -হাঁস, মুরগি ইত্যাদি), বাঁশের কঞ্চি, পাটাতন, শন, (বর্তমানে) রেডিয়ামের তার (পূর্বে প্লাস্টিকের তার) সহযোগে সাজানো হয় এর চূড়া। এছাড়াও গলার নীচে চরিত্রকে রূপ দিতে এবং মুখোশের সঙ্গী হতে শিল্পীদের পরানো হয় পোশাক (বুকে এবং পিঠে), কোমরে পরানো হয় কোমরবন্ধনী, অ্যাঙ্কলেট এবং বিভিন্ন ধরনের স্টান্টের জন্য শিল্পীদের সুরক্ষাস্বার্থে পরানো হয় নীক্যাপ, মোজা। তারপর সাজকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে দুইহাতে বেঁধে দেওয়া হয় রুমাল।

শৌখিন সুগন্ধী শামামায় ডুববে কী আর চিৎপুর!

দেবজ্যোতি মান্না

স্মৃতির পাতা কী আর ফিরবে সৌখিন বাঙালিয়ানাতে ! মাতবে আতরের আতরিয়ানায়! কুঁচি দেওয়া সাদা ধুতি , নকশা করা মসলিনের পাঞ্জাবি , সুর্মাটানা চোখের কোণ আর মিঠে আতরের মলিনতায় এ ছিল এক অন্য শহর। শঙ্খ ঘোষের কথায়," ঠিক যেন , কলকাতার মধ্যে থাকা আরেকটা কলকাতা"। ১৬১০ , সেকালের চিৎপুর। একটা সময় এই চিৎপুরই ছিল কলকাতার নবাবি বাঙালিদের বাবুয়ানার আঁতুরঘর। এই ' কলকাতা ' তখনও গ্যাস বাতির আলো দেখেনি । দপ দপ করা কেরোসিনের বাতিতে রাতের চিৎপুরকে দেখাতো একেবারে অন্য রকম। ফিটন গাড়ির ভিড়, বাঈজিবাড়ি থেকে ভেসে আসা ম্যায়ফিলের গান আর হরেক সুগন্ধির মিলমিশে গঙ্গাবক্ষের এই এলাকাটি হয়ে উঠতো স্বর্গের নন্দনকানন। আজ চিৎপুর রয়ে গেছে , রয়ে গেছে তার বুকে মাথা উচুঁ করে থাকা ইমারত, সেকেলে বাড়ির ভিড় , মরিচা ধরা ট্রামের লাইন, শতাব্দী প্রাচীণ রাস্তা এবং প্রমান স্বরূপ তাঁর রেখে যাওয়া সেই দোকান। রয়ে গিয়েছে পসার সাজানো নানান সুগন্ধির সারি। কেবল হারিয়েছে, মেজাজে ঘেরা বাঙালির আতরপ্রেম। এখন বাঙালির সৌখিনতার নতুন সংজ্ঞা নামি দামী পারফিউম আর ডিও।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্র সরণি এবং কলুটোলার মোড়ে এক ফৌজদারি বালাখানার একতলায় ছোট্ট একটা আতরের দোকান চালাতেন হাজি খুদা বখ্‌শ। ভোর পাঁচটা থেকে দোকান খুলে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলতো দেদার বেচাকেনা। বেল, জুঁই, গোলাপ, রজনীগন্ধা, চন্দন এবং খসের সুগন্ধে ভরে যেতো গোটা চত্বর। গন্ধবিলাসী বাঙালিদের কাছে, খুদা বখ্‌শ তখন সুগন্ধির ফারহিস্তা স্বরূপ। তাঁর আতরখানার তিনটি আতর ছিল বেশ জনপ্রিয়। শামামা, মুস্ক, ও হিনার। যার মধ্যে শামামা এবং মুস্ক তৈরি হতো জাফরান সহ বিভিন্ন মশলার মিশ্রণ সহযোগে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ আতরকে একত্রে মিশিয়ে তৈরি হতো হায়াতি, সাবা এবং অপ্সরা।সেই থেকে আজও সদর্পে রয়ে গেছে এই দোকানটি। শুধু সৌখিন বাবুগিরিতেই নয়, এই আতরের মেহেক পৌঁছেছিলো বাঙালির অন্দরেও। খোদ ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলও নাকি সুবাসিত হয়েছিলো বখ্‌শের আতরে। এছাড়া আবুল কালাম আজাদ, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শাহিদ সুরাবর্দি, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান, নুরুল হাসান, গনি খান চৌধুরীর এমনকি স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও নাকি ছিলেন খুদা বক্সের আতরে তন্ময়। তবে এখন সময় বদলেছে। সেই সঙ্গে বদলে গিয়েছে মানুষের সুগন্ধী প্রেমও। তাই আজকের ডিও , পারফিউমের যুগে দাঁড়িয়ে বাঙালির শৌখিনতা ফের আতরপ্রেমে মজবে কিনা! এখন শুধু এটাই দেখবার।

মিশন সমুদ্রায়ন : প্রস্তুত 'মৎস্য ৬০০০'

সময়িতা দাস

কেবল মহাকাশ নয় মহাসমুদ্রেও ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে ভারত। সমুদ্র তলদেশের গভীরে প্রবেশ করে তথ্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রথম মনুষ্যবাহী সাবমার্সিবেল সাবমেরিন অভিযানে প্রস্তুত হচ্ছে আমাদের দেশ। 'চন্দ্রযান ৩' এর সাফল্যের রেশ না কাটতেই 'আদিত্য এল ওয়ান' এর মাধ্যমে সৌর মিশনের কথা ঘোষণা করে 'ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন' বা 'ইসরো'।২রা সেপ্টেম্বর ২০২৩,সূর্য সম্পর্কিত তথ্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে মহাকাশের দিকে সাফল্যের সাথে রওনা হয় 'আদিত্য এল ওয়ান'।

এরপর ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অন্যতম হল সামুদ্রিক সম্পদ ও জলতলের জীববৈচিত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নির্মাণ, সমুদ্রতলের ৬০০০ মিটার গভীরে প্রবেশ করে সামুদ্রিক খনিজ পদার্থ যেমন-পলিমেটালিক নডিউল,কোবাল্ট সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ ক্রাস্ট ও হাইড্রোথার্মাল খুঁজে তা নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা। পলিমেটালিক নডিউলগুলির মধ্যে থাকে তামা, নিকেল,কোবাল্ট ও ম্যাঙ্গানিজ এর মতন অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু, ফলে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত এসমস্ত খনিজ এবং সম্পদগুলি দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হবে, যা 'নীল অর্থনীতির' ধারণাটির সাথে সংযুক্ত। এছাড়াও সমুদ্রের নোনা জল থেকে পানীয় জলে রূপান্তর ও বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বিষয়ক অনুসন্ধান, সমুদ্রতলের প্রবেশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৬ সালে ৬০০০ মিটার গভীরতায় প্রবেশ করবে 'মৎস্য ৬০০০'। মনুষ্যবাহী অভিযান হওয়ায় 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওশান টেকনোলজি' তথা 'মৎস্য ৬০০০' নামক সাবমার্সিবেল সাবমেরিন নির্মাণ সংস্থা, যাবতীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ও অত্যাধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সাবমেরিনটি নির্মাণ করেছেন। যা সমুদ্রতলে একটানা ১২ ঘণ্টা কাজ করতে সক্ষম। জরুরী কালীন পরিস্থিতিতে গভীর সমুদ্রের জলের চাপ সহন করে প্রায় ৯৬ ঘন্টা টিকে থাকার ক্ষমতা রয়েছে 'মৎস্য ৬০০০'-এর।সমুদ্র অভিযানটির মেয়াদ ৫ বছর। যার ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ৪০৭৭ কোটি টাকা। দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি, জীবিকার

লক্ষ্যবিন্দু মহাসমুদ্র। ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষে শুরু হয় সমুদ্র অভিযানের সাবমার্সিবেল সাবমেরিন 'মৎস্য ৬০০০' এর নির্মাণ কাজ। যা ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।সমুদ্র অভিযানটির বেশ কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, যার মধ্যে জৈববৈচিত্র, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানের করতে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে সাহায্য করবে এই সমুদ্র অভিযান। ২০২৪ সালে বঙ্গোপসাগরে তিনজন বিজ্ঞানী নিয়ে শুরু হবে অভিযানটির ট্রায়াল রান। সেক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে সমুদ্রগর্ভের ৫০০ মিটার গভীরে ক্ষেত্রে উন্নতি, কর্মসংস্থান, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এই অভিযানটির অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। এই সমুদ্র অভিযানের পূর্বে দুটি অভিযান তথা সৌর অভিযান ও চন্দ্রযান ভারতের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক শাখায় নতুন পালক সংযুক্ত করেছে।

চন্দ্রাভিযানের অনুপ্রেরণায় কি দুঃসাহসী টিনটিন!

পাপিয়া দাস

টিনটিন, এই ছোট সাংবাদিকে কে না চেনে? বেলজীয় কার্টুন শিল্পী জর্জেস রেমি ওরফে হার্জ- এর রচিত কমিক স্ট্রিপ টিনটিনের অভিযান সিরিজের প্রধান চরিত্র টিনটিন। এই টিনটিনের হাত ধরে আমাদেরও দুঃসাহসিকতার অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়, কৃষ্ণদ্বীপে রহস্য উদঘাটন থেকে শুরু করে প্রথম চাঁদে ভ্রমন । ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত চাঁদের অভিযাত্রীরা সিরিজে প্রথম টিনটিন চাঁদে পা রাখে, যা সেই সময় দাঁড়িয়ে কল্পনা করাও দুষ্কর ছিল। এই সিরিজটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দুই দশক পরে ১৯৬৯ সালে ২১ জুলাই মাসে আমেরিকার নভোচারী নীল আমস্ট্রং প্রথম চাঁদে পদার্পণ করেন।

দুঃসাহসী টিনটিনের অন্যতম প্রধান চরিত্র অধ্যাপক ক্যালকুলাসের তৈরি রকেটে চেপে টিনটিন, তার পোষ্য স্নয়ী, ক্যাপ্টেন হ্যাডক ও অধ্যাপককে সহকারি চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনাকে পেরিয়ে রকেটটি হিপারকাস ক্রেটারে অবতরণ করে। টিনটিন ও তা সহকারীরা মিলে অপটিক্যাল এবং ট্যাঙ্কের মাধ্যমে অনুসন্ধানমূলক কাজকর্ম চালায় অজানা তথ্যের খোঁজে।

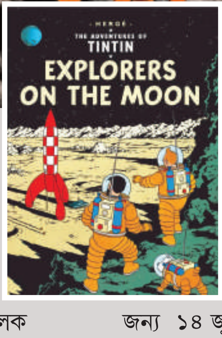

হার্জ যা তার কমিক সিরিজে একবারে যা করে দেখিয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। বিভিন্ন দেশ নানান সময়ে নানান ধরনের যান চাঁদে পাঠাচ্ছে রহস্য উদঘাটনের জন্য। টিনটিন ও তার সঙ্গীরা টলেমাস ক্রেটারের দিকে কিছু স্ট্যালাক্টাইট গুহা ঘুরে দেখেন, তার মধ্যে একটি গুহার ভিতরে তুষারময় খাদ খুঁজে পায় একদিনের মধ্যে। স্পেস প্রোব ক্লেমেন্টাইন সংবেদনশীল রাডার সরঞ্জাম দিয়ে চাঁদে সেই রকম একটি বরফ জমা লেকের সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে নাসার সেখানে সময় লেগেছে দুবছর। সময় লাগছে ঠিকই, তবে কমিকের সাথে বাস্তবের মিল ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এই অনুসন্ধানে কাজে অংশগ্রহণের জন্য ১৪ জুলাই ২০২৩ ভারত তার তৃতীয় চন্দ্রযান 'চান্দ্রায়ান-৩' অন্ধ্রপ্রদেশের ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে লঞ্চ করেছে। লক্ষ্য ৪২ দিন পর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ। পূর্বের 'চান্দ্রায়ান-২' চাঁদের মাটিতে নামার আগেই আছড়ে পড়ে। তাই এইবার চন্দ্রযানের মধ্যে রয়েছে কেবল একটি ল্যান্ডার ও রোভার। অধ্যাপক ক্যালকুলাস তার রকেটের রেডিও ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে পৃথিবীতে থাকা তার সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। কিন্তু 'চান্দ্রায়ান-৩' ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও ভূখন্ডীও ম্যাপিং এর প্রয়োজনীয়তার জন্য 'চান্দ্রায়ান-২' এর সাথে লঞ্চ করা অরবিটকে ব্যবহার করা হবে।

Plethora of financial information @ RBI, Kolkata

Sandeep Sikder

The City of Joy has a deep root connection with the financial personalities and instituitions of India,be it- The huge treasures of Jagat Seth or the banks and mints opened in the colonial era.It may not be known to all that both the RBI and SBI started functioning from the Calcutta, before moving permanently to Mumbai.Therefore it is quite obvious that Kolkata is the home to banking museums. The museum is centrally air conditioned and is open to all from 10:00 AM to 5:00 PM excluding Monday and national holidays. SBI already has an archive and museum in Kolkata since 2007.Now,the RBI has recently opened it's museum and it's operational from March 2019.The move of the RBI came 21 years later after it opened a museum in Mumbai.The museum is located at 8 Council House Street and probably a few hundred metres from the RBI Kolkata office.The first governor of the RBI-Sir Osborne Smith assumed office in this building in 1935 and the first general meeting of the shareholders was held in 1936.

The reception area of the museum is a small souvenir shop which sells memorabilia made of shredded notes while the walls were being decorated with the shreded notes and the pillars with the old discarded coins. The ground floor of the museum contained a 12 feet high statue depicting evolution of

money from barter system to coins & notes,then to plastic currency i.e debit and credit cards,then to online payments and finally to Cryptocurrency.

The museum also contains rare and high value notes of various countries like- Angola,Argentina,Romania, Yugoslavia,etc. It also contained 10,000 dinar note from Iraq-probably the last note of Saddam's regime.For the kids there is an arrangement of games and quizzes to make the place interesting for them.

জলস্তর বাড়ছে: কলকাতার কী এবার পাতাল প্রবেশ!

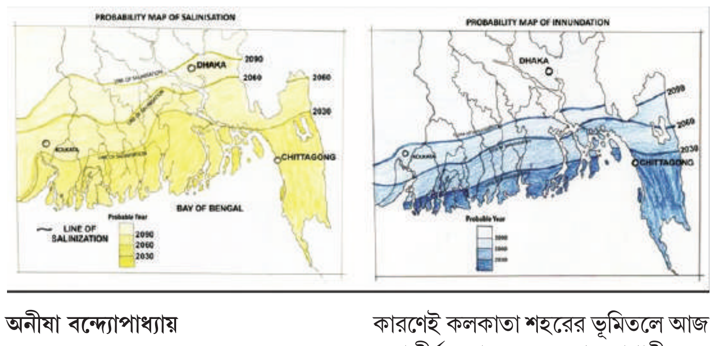

অনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সারা পৃথিবীর সঙ্গে কলকাতার ও আশেপাশের জলস্থল বাড়ছে। কারণ মেরু প্রদেশে বরফ গলা জল নেমে আসছে। অন্যদিকে কলকাতার ভূমিতলে ফাটল, বসে যাচ্ছে ভূ-স্তর । আকাশছো বহুতলের ভিড়ের কংক্রিটের চাপে, জলস্তর বৃদ্ধি, মেট্রোরেলের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বহু কারণেই কলকাতা শহরের ভূমিতলে আজ জরাজীর্ণ। যার ফলস্বরূপ আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে কলকাতার শহর ডুবে যেতে পারে জলের তলায়, এমনটাই আশঙ্কা করছে বিজ্ঞানী মহল। কয়েক বছরের মধ্যেই এই প্রক্রিয়ার সূচনা হতে পারে খিদিরপুর অঞ্চল থেকে বলে জানিয়েছে ভূ বিজ্ঞানী ডঃ সুজিব কর। তার এই সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে IOSR journal of environment science, technology and food technology এর আন্তর্জাতিক পত্রিকার ভলিউম ১৩, ইস্যু ১৩ সংখ্যায়। শুধু তিনি নন বেশ কয়েক বছর ধরে বহু বিজ্ঞানী কলকাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। পৃথিবীর সার্বিক উচ্চতা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই মেরুর বরফ দ্রুত গলছে যা পৃথিবীর জলস্তরকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি শহরাঞ্চলের ভূগর্ভে অবস্থিত বেডরকের একটি স্থায়ী ভার বহন ক্ষমতা আছে। কলকাতার ক্ষেত্রে সেই মাত্রা ছাপিয়ে গিয়ে বর্তমানে অনেক বেশি চাপ পড়ছে। এই কারণেই কলকাতা পৌরসভা বিল্ডিং গাইড রুলে দশ তলার বেশি উঁচু বহুতল নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হতো না। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে কলকাতায় বহু উচ্চতল আবাসন তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন বহু যুগ ধরে কলকাতার ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ায় মাটির নিচের তলদেশে থাপা অংশের সৃষ্টি হয়েছে যা অত্যাধিক ভার বহনে সক্ষম নয়। ফলে এখন এই আশঙ্কা তৈরীর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডঃ করের সমীক্ষায় উঠে এসেছে ব্রিটিশ শাসনকালে সমুদ্র তল থেকে কলকাতা শহরের উচ্চতা ছিল ৭ মিটার যা বর্তমানে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৪ মিটারে। ভূবিজ্ঞানীর মতে বিপদের সম্ভাবনা অনেকটা বাড়িয়েছে মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের কাজ। আবার জলসেচ করে আনার প্রবণতা ও বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ধৌত প্রক্রিয়ায় মাটির উপরের স্তর ক্ষয়ে গিয়ে বাগজোলা ও হুগলি নদীতে পড়া। অন্যদিকে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে শহরাঞ্চলে ঢুকে পড়লে নোনা জলে অনেক জীববৈচিত্রের ক্ষতি হবে। এ থেকে রক্ষা পেতে গেলে উপকূলে স্থায়ী কাঠামো গঠনে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। বহুতল আবাসন বানানো কমিয়ে ভৌমজলে অযথা চাপ সৃষ্টি দ্রুত বন্ধ হওয়া দরকার।

El Nino : New global alert

Nourin Sultana

This summer, heatwaves are expected to be more likely, and crop loss in eastern India, particularly Bengal, and the northeast is a concern, according to meteorologists and climate scientists. After producing precipitation over the Western Himalayas, western disturbances move eastward into the country's eastern region. Simultaneously, if there is a system in the North Bay of Bengal, both systems interact with one another, bringing a significant amount of rain to the East and Northeast. However, according to meteorologists, we did not observe many active western disturbances, and

even the north Bay of Bengal saw less rainfall. Due to El Niño and Cyclone 'Biparjoy' the monsoon season in South Bengal has been postponed. On the first week, light rains showered in a few different places in the city, providing some reprieve for the citizens. But in another two days, the monsoon is predicted to reach the mountainous areas of Bengal and especially the Dooars. The Central and Eastern Equatorial Pacific Ocean's surface temperatures rise during an El Niño, which is defined by this phenomenon. A band of warmer water moving from west to east across the equatorial Pacific Ocean is referred to as an 'El Niño'. Similar to how a band of cooler water moves from east to west, a La Niña happens. The El Niño Southern Oscillation, which is a cyclical phenomenon made up of El Niño and La Niña, releases a lot of heat into the atmosphere as warm water spreads throughout the tropical Pacific.

স্মৃতি পথপানে স্মৃতি সুধায়

৭৫ বছর স্পর্শ করতে চলা এই বিভাগ বারে বারে রিদ্ধ, সিক্ত হয়েছে একের পর এক অতিথি অধ্যাপকের দৃপ্ত পদচারণায়। কারণ, কালের নিয়মেই এই বিভাগে সবসময় স্থায়ী অধ্যাপকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম — যেটা একটি প্র্যাকটিক্যালমুখী বিষয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কালের কপোলতলে তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, স্মৃতি আজও সমুজ্জ্বল। আজ কেউ নয়ের কোটা পেরিয়েছেন, কেউ স্ট্রোকের ধাক্কা সামলে উঠলেও দৃপ্ত বাকশক্তি হারিয়েছেন। কেউ লাঠি নির্ভর। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি-জীবনের সামান্য কিছু উপলখণ্ড সংগ্রহ করে...

অনুলিখনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী রাতুল দত্ত।

পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়

সাংবাদিকতা নয়, বরং খবরের কাগজ ছাপা বা নতুন প্রযুক্তি এনে আনন্দবাজার পত্রিকার ছাপার মনোন্নয়ন ঘটানো ছিল আমার দীর্ঘ জীবনের মূল কাজ। ফলে তার কিছু অংশ অর্থাৎ নিউজপেপার ম্যানেজমেন্ট পড়াতে ভালই লাগত। ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত সরাসরি পড়ানো এবং এরপর ২০১৭ পর্যন্ত নানা ধরণের সহযোগী কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এখানে আমায় এনেছিলেন সৌরিন বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকার মতো বিশ্বখ্যাত এই সংবাদপত্রের দীর্ঘ ১৫ বছর মুদ্রক ও প্রকাশকের দায়িত্ব সামলানোর সঙ্গে তাঁদের ম্যানেজমেন্ট টিমের অন্যতম সদস্য থাকার কারণে বহু নতুন বিষয়, প্রযুক্তি যেমন শিখেছি; তেমনই এখানে ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে গিয়েছি। বিভাগে কখনই নিজেদের অতিথি বলে মনে হয়নি। শেষ এসেছিলাম ২০১৭ সালে। বয়স ৯০ পেরিয়েছে। মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরীখে বলব, সরাসরি খবরের লোক না হয়েও সংবাদমাধ্যম চালানোর দিকে কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। আগামী দিনের সংবাদমাধ্যম কিভাবে চলবে, বুঝতে শেখো।

ড. মলয় মিত্র

এই বিভাগের প্রতিটি ইঁট-পাথরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি। ছাত্র হিসাবে ১৯৬৫ সালে এসেছিলাম। পরবর্তীকালে তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান সুনীত মুখোপাধ্যায়ের কাছে গবেষণা, ১৯৯৩তে ডক্টরেট। এর আগেই অবশ্য ১৯৮৭ সালে এই বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পা রাখার সৌভাগ্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়াতে আসতেন আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ নীরদ ভট্টাচার্য, সাংবাদিকতার ইতিহাস পড়াতেন মোহিত মিত্র, সমর বসুর মত দিকপাল ব্যক্তিত্ব পড়াতেন জনসংযোগ। আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন সমরবাবুই। তাঁর কথার অর্থ-নির্দেশ। সৌরিনবাবু এবং ফনীবাবু পড়াতেন এডিটিং। আমি প্রথম থেকেই সংবাদ এজেন্সির সাংবাদিকতার দিকটি পড়াতাম। পরবর্তীকালে কিছু বছর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম পড়াতে হয়েছে। ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলাম দক্ষিণারঞ্জন বসু, বীরেন মুখার্জি, বিধুভূষণ সেনগুপ্তকে। বীরেনবাবু পড়াতেন সংবাদমাধ্যমের আইনের দিক। যেন এক্কেবারে সাহেব। অধ্যাপক ড. তপতী বসু এবং পরবর্তীকালে ড. অঞ্জন বেরার সঙ্গে বহু সুন্দর সময় কাটিয়েছি। সোনাঝরা সেসব স্মৃতি।

রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বাবা পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে। আমিও তাই, তবে গ্রামে নয়, হাওড়া শহরের একটা মাধ্যমিক স্কুলে। পড়াতে পড়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে পড়েছি। পড়াতেন সাংবাদিকতা ও শিক্ষা জগতের কয়েকজন দিকপাল ব্যক্তিত্ব। পাঠ্যপুস্তক বলতে কোনো ভারতীয় বই ছিল না বললেই চলে। ছিল দুই প্রবীণ সাংবাদিকের দুটি বই - সাংবাদিকতার সামগ্রিক বিষয়ের উপর বিধুভূষণ সেনগুপ্তের ছোট একটা বই এবং ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাস সম্পর্কে মোহিত মৈত্রের একটি অসম্পূর্ণ বই।

সময়টা ষাটের দশকের শেষাশেষি হলেও তখনও সাংবাদিকতার ডিগ্রি-ডিপ্লোমাকে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা হিসাবে গুরুত্বই দিত না সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি। নেহাৎ বরাত জোরেই একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকায়। প্রথমে শিক্ষানবিশ, তারপর স্থায়ী চাকরি। রিপোর্টিং দিয়ে শুরু ও শেষ, মাঝে দীর্ঘ সময় সম্পাদনা বিভাগে। শিখেছি অনেক সন্তোষকুমার ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, বরুণ সেনগুপ্ত প্রমুখ বহু প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিকের কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান তপতী বসু একদিন ডেকে পাঠিয়ে পড়ানোর প্রস্তাব দিলেন। সেটা ১৯৯৬ সাল হবে। আজকাল-এর অসীম কুমার মিত্র আর বর্তমান-এর তুলসী দত্ত সম্পাদনা বিষয়টি পড়াতেন, সেই সঙ্গে যুক্ত হলাম আমি। রিপোর্টিং পড়াতেন ইউ এন আই-এর মলয় মিত্র। সংবাদপত্র পরিচালনা পড়াতেন আনন্দবাজারের পবিত্র মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন জয় সরকার, বি কে সাহু, শান্তনু সান্যাল, স্নেহাশিস শূর, অশোক মুখোপাধ্যায়, অলক গুহ প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রের কৃতীজন। সবাই আংশিক সময়ের।

শেষে ছাত্রছাত্রীদের বলি, এই বিভাগে যখন এসেছ ,তখন এম এ ডিগ্রিটা পাবেই। কিন্তু মনে রেখ, ওটা সাংবাদিক হওয়ার চাবিকাঠি নয়। সেজন্য দরকার লেখা ও বলার ক্ষমতা। এটা স্টেজে মারা যাবে না। অভ্যাস করতে হবে নিরন্তর।

তুলসী দত্ত

তখন সবেমাত্র কলকাতার বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্রে কম্পিউটারে পাতা সাজানোর বিষয়গুলি আসছে। আমিও 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর মুম্বই সংস্করণ ছেড়ে 'বর্তমান' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত-র ডাকে তাঁর পত্রিকায় যোগ দিলাম। একইসঙ্গে কয়েকদিন পরে এই বিভাগে। মূলত তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. তপতী বসু আমায় রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আনন্দবাজার পত্রিকা) এবং অসীম মিত্র (আজকাল)-এর সঙ্গে এডিটিং পড়ানোর জন্য দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। অর্থ তো নামমাত্র। দায়িত্ব অনেক। এমন অনেক দিন গিয়েছে, সপ্তাহে রোজ বিশ্ববিদ্যালয় এসেছি। রাত ৯টা, বিভাগ থেকে বেরোনোর সময় দেখেছি, লিফটম্যান ঠিক বসে রয়েছেন। তখন বুঝতাম, বিভাগের একটা ছাপ, ওজন যেন অঘোষিতভাবে সর্বত্র কাজ করছে। হাতে-কলমে কীভাবে কম্পিউটারে নানা সফটওয়্যার ব্যবহার করে পৃষ্ঠাসজ্জা করবে, সেটাই দীর্ঘদিন পড়াতাম। আরেকটি বিষয়ে খুব ভালো লাগতো, একটি বন্ধুত্বের আবহ। কখনও পর বলে মনে হয়নি কাউকে। ভালো লাগে, আমাদের হয়তো তৈরি বহু ছাত্রছাত্রী আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

শান্তনু সান্যাল

১৯৯৩ সাল নাগাদ হবে। আমি তখন 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার অন্যতম সিনিয়র সাংবাদিক। পরবর্তীকালে অবশ্য 'হিন্দু বিজনেস লাইন' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছি। সে সময় 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার মালিক এম রাম-এর মাধ্যমে ড. তপতী বসু একদিন ফোন করে বললেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্সিয়াল জার্নালিজম চালু করছি। কাল থেকে আপনি পড়াবেন। পরবর্তীকালে ২০১৬ পর্যন্ত বিভাগে যুক্ত ছিলাম নানাভাবে। আমি সেই অর্থে সাংবাদিকতার ছাত্র নই। কিন্তু অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে বুঝতাম, জিডিপি থেকে বাজেট, জিএনপি থেকে মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সাংবাদিকতার ক্লাসে বোঝানো কতটা কঠিন। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আমাদের বহু ছাত্র আজ অনেক উচ্চপদে আসীন।

অশোক দাশগুপ্ত

প্রথম জীবনে বৈমানিক থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে এসে পেশা বদল করে আনন্দবাজার পত্রিকা। সেখানে ২০ বছর যুক্ত থেকে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'। মাঝে কয়েক বছর সরস্বতী প্রেস। ওড়িশার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'সংবাদ'-এর প্রকাশনার সর্বোচ্চ পদে চাকরি। বর্তমানে প্রায় ৮০ ছুঁইছুঁই জীবনেও উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর। ১৯৬১-তে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরিকে সংবাদপত্রের বৃত্তে প্রথম প্রবেশ ধরলে ৬২ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি হলাম এক অসংবাদিক ব্যক্তি। ১৯৯৬-২০১৬, মূলত নিউজপেপার ম্যানেজমেন্ট পড়ানো ছিল আমার দায়িত্ব। সঙ্গে ছাপা, রং, প্রকাশনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া। আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রক ও প্রকাশক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় আমার নাম তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. তপতী বসুর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন। তখন সবেমাত্র অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রিন্টিং টেকনোলজি পড়াতে এসেছি। তবে এখানে, পরবর্তীকালে প্রত্যেক অতিথি ও স্থায়ী অধ্যাপকদের সুন্দর ব্যবহার, কীভাবে পড়ালে উপকার হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ ছাত্রছাত্রীদের অনেক কাজে লেগেছে বলেই ধারণা।

Schooling in Journalism

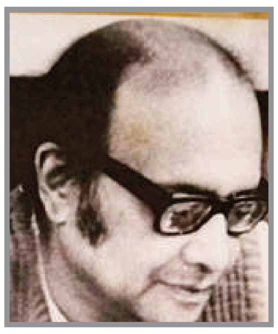

Sunit Kumar Mukherjee

Journalistic education is of rather recent origin. The University of Missouri in Columbia, U.S.A. was the first to start in 1908 a formalised academic programme leading to a degree in Journalism. Since then several school of journalism have sprung in America, a number of which offer the Ph.D. However, it has to be remembered that even in a country like United States where leading universities boast of carefully planned and well-developed departments for studies in journalism, the prejudice on the part of newspaper not to recruit graduates of journalism owners persisted for a long time. Not that the prejudice is entirely gone but today there is a greater awareness and realisation of the fact that journalism graduates can be as good as any other person recruited, minus a degree in journalism. Teaching of journalism is a rather new experience in this country and the architects responsible for introducing this new course visualised the role the journalism was to play in changed set-up of this country. True, a number of applicants are guided more by the glamour that journalism holds. But a large majority of them are serious students with impressive academic standing. A large number of former students of the Department of Journalism of Calcutta University have given a good account of themselves in different media of communications, including radio, television, publicity and advertisements. The newsmen, busy at their respective desks, are too pre-occupied to lend any help, not to speak of the rather cold, cynical and callous attitude that some of them take towards these students, who, not knowing what to do move from pillar to post trying to elicit whatever Interest, sympathy and consideration they can get from the more sympathetic and friendly staff members.

In Calcutta the university authorities, no doubt, realise the problem and the predicament faced by the department but have hardly done anything worthwhile to solve the problem pleading financial distress.Last but not least, there is a problem to find suitable teachers for journalism. Most media people are too busy while some assist the departments as part-timers. It is difficult to run a department with part time teachers or guest lecturers. Calcutta University's Department of Journalism was run by a group of part time lecturers , nearly three decades (the department was started in 1950) and even today it has only limited full time teacher.

লেখক অমৃতবাজার পত্রিকার সহ সম্পাদক এবং বিভাগের প্রথম সম্পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। ১৯৮৩ সালে সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি বিখ্যাত জার্নাল, The Journalist। আজকের দিনেও ভীষণ প্রাসঙ্গিক এই লেখাটি সেখান থেকে সম্পাদনা করে পুনঃমুদ্রিত।

শ্রেষ্ঠত্বের আসন 'চেয়ার প্রফেসর'

অদিতি তালুকদার

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরতে পরতে মিশে আছে বিভিন্ন গৌরবময় কাহিনী। শিক্ষাদান ও অন্যান্য বহু কৃতিকর্মের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের মুকুটে একের পর এক পালক যোগ করেছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫৫টি 'চেয়ার প্রফেসর' আসন রয়েছে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে। যার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে রয়েছে এই রূপ ২৮টি আসন কলা বিভাগে ২২ এবং বাণিজ্য বিভাগে রয়েছে ১টি আসন। এই প্রতিটি আসন বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা বাড়িয়ে চলেছে।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ থেকে শুরু করে তারকনাথ পালিত, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সহ আরো কিছু বিশিষ্টজনেরা। আসনগুলিতে অধিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও রয়েছে মাপকাঠি। একএকটি আসনে অধিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি একেক রকম। অবসরগ্রহণ হোক বা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে- এই আসন থেকেও অবকাশ নিতে হয়।

১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ১০ লক্ষ টাকার বৃত্তিদান করেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। ১৮৭৫ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর ল' পদেও নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞান বিভাগীয় বিষয়ের মধ্যে তাঁর নামানুসারে রয়েছে মোট সাতটি অধ্যাপকের পদ (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণরসায়নবিদ্যা, ফলিত পদার্থবিদ্যা, ফলিত রসায়নবিদ্যা এবং ফলিত গণিত)।

নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সিভি রমন প্রথম পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে এই পদে অধিষ্ঠান করেন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ অমিতাভ রায়চৌধুরী। ১৯২২ সালে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং ধ্বনিতত্ত্বে 'খয়রা অধ্যাপক' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁর নামানুসারে রয়েছে চারটি অধ্যাপকের পদ– রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় রয়েছে দুটি পদ এবং কলা বিভাগের অন্তর্গত বাকি দুটি। ১৯৪৯ সালে শিশিরকুমার মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

রেডিওফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স ইনস্টিটিউট চালু করেন। তাঁকে স্মরণে রাখতে স্থাপিত হয়েছে এসকে মিত্র অধ্যাপকের পদটি। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর (নৃতত্ত্ববিদ্যা)– যেখানে বর্তমানে রয়েছেন অধ্যাপক সুব্রত শংকর বাগচী। আবার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্মরণে রয়েছে আচার্য পিসি রায় অধ্যাপকের পদ (কৃষিরসায়নবিদ্যা)। ১৯১৬ সালে তিনি রসায়নবিদ্যার প্রথম পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রয়েছে দুটি নীলরতন সরকার অধ্যাপকের পদ (শারীরবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যা)। বিজ্ঞান বিভাগে রয়েছে আরও কিছু অধ্যাপকের পদ। যেমন- ডঃ বিসি গুহ (প্রাণরসায়নবিদ্যা), শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে দুটি সেন্টেনারি অধ্যাপকের পদ (রাশিবিজ্ঞান এবং প্রাণরসায়নবিদ্যা), এসএন প্রধান ও সিক্তা প্রধান (উভয়ই স্নায়ুবিজ্ঞান), হীরালাল মজুমদার (মৎস্যবিজ্ঞান), নগেন্দ্রনাথ দাস (স্নায়ুশারীরবিদ্যা), লাবণ্যময়ী (ফলিত পদার্থবিদ্যা), ডঃ এইচএন ঘোষ (ফলিত পুষ্টিবিদ্যা), এসএন বসু (ফলিত গণিত) এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে 'আশুতোষ অধ্যাপকের পদ' (বিশুদ্ধ গণিত)। কলা বিভাগের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে একটি পদ (রাজনীতিবিদ্যা), বাংলা বিভাগে রয়েছে তিনটি পদ– কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামানুসারে 'ঠাকুর অধ্যাপকের পদ', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ীর নামে রয়েছে আরও দুটি পদ। এছাড়াও স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি (ইংরেজি), নুরুল হাসান (ইতিহাস), বাবু জগজীবন রাম (সমাজবিদ্যা), রানী ভাগ্যেশ্বরী (ভারতীয় শিল্পকলা), মুন্সি প্রেমচাঁদ (হিন্দি), কবি ইকবাল (উর্দু), ভারতী (তামিল), মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ (সংস্কৃত), কারমাইকেল (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি)– যেটি বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ব্যারন কারমাইকেলের নামে প্রতিষ্ঠিত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে রয়েছে তিনটি পদ (আধুনিক ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস, সংস্কৃত এবং আরবি ও ফারসি), এসএন ব্যানার্জি (রাজনীতিবিদ্যা), এসপি মুখার্জি (সমাজবিদ্যা ও মানবাধিকার), আচার্য বিএন শীল (দর্শনশাস্ত্র), আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সেন্টেনারি পদ (ইতিহাস বিভাগের অন্তর্গত), রাজীব গান্ধী (বাস্তুতন্ত্র ও স্থায়ী উন্নয়ন সম্পর্কিত সমসাময়িক বিষয়)। এছাড়া রয়েছে দুটি খয়রা অধ্যাপকের পদ (কৃষিবিদ্যা এবং ভাষাতত্ত্ব)।

Modern Newspaper Techniques & Management

Pabitra Kr. Mukherji

Having some critical insight into the affairs of the times, an American philosopher long ago christened our epoch that of "The managerial revolution". He meant to emphasise that, in contrast to the bygone period of the industrial revolution", when the mainspring of economic progress lay in technological development, the contemporary era depended for its motive power on personal skills of leadership and commercial acumen- the ability of some people to impel economic progress by their direction and co-ordinating of other people's individual efforts in the business of living. Divine providence did not leave him long enough on earth to see how accurately his appraisal would hold true, even in circumstances where once again the technological factor exerts a major force for the world of industry and commerce has entered on to another transformation, with highly complex automatic equipment and intricate electronic instrumentation as the foExactly what the term management is not always clear, and not always agreed. What is clear and agreed is that it does mean some form of personal command of a situation such that technological, commercial and human aspects are interwoven into successful progress.

This modern world with the progress of civilisation has turned the simple mechanism of exchange i.e., barter system of acquisition of goods by the exchange of other goods into the complex structure of the twentieth century world-wide industrial and commercial system, with its innumerable manufacturing units of all sizes and kinds and its regions of trading, transport and financial houses. The complex pattern of economic activities forms the background of management. Despite its complexity in action, it rests on simple principle, all economic activity is directed to a parallel two-fold aim of supplying the goods and services that consumers need, and providing the means by which they can purchase those goods and services. In this age of information, communication is truely global. It is rather universal; inter-planetory. We can think of a global village for exchange of views in twinkles of seconds, sophisticated application of telecommunications technology will lead to the formation of more networks and groups.

The communication that is sharing of information has evolved over the ages from gesturing, speaking and writing to printing, telegraph, telephone, radio, television, videos and facsimile, through electronics, computers, fibre optics, laser, holography and satellites

১৯৮৩ সালে সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি বিখ্যাত জার্নাল, The Journalist। আজকের দিনেও ভীষণ প্রাসঙ্গিক এই লেখাটি সেখান থেকে সম্পাদনা করে পুনঃমুদ্রিত। লেখক আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রক, প্রকাশক এবং বিভাগের প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক।

Story telling Ad: Now a new frontier

Sreejita Das

Meeting her family at a cafe. The ad develops the characters of Arpita and her family in a way that is both heartwarming and heartbreaking. We see her journey from being a young woman who is afraid of being rejected by her family to being a confident woman who is surrounded by love and acceptance. We also see the family's journey from being traditional and conservative to being accepting and loving. Throughout our life, stories have been woven into our being, starting from the moments when our mother cradled us in her arms.

Another story I recently stumbled upon, and it's nothing short of a personal revelation. From acceptance and empowerment to equality and social responsibility, these narratives embody the evolving values and aspirations of contemporary audiences.

In India's dynamic advertising landscape, traditional promotion methods are giving way to storytelling ads that emotionally connect with consumers. In 2022, digital advertising revenue in India reached 499 billion INR, contributing to a total advertising revenue of over 1 trillion INR. Demand for consumer appliances, creating competition and the need for customized storytelling to engage India's growing middle class has increased customers in Tier-II and Tier-III cities In conclusion, storytelling advertisements have transformed the Indian advertising landscape, challenging traditional methods and ushering in a new era of marketing.

NEP and Journalism Education in C.U.

Dr. Soumya Dutta

The National Education policy envisage significant changes in the higher education system by promoting multidisciplinary education, encouraging research and innovation, increasing access to education and integrating vocational education. Journalism and Mass Communication in higher education institutions will play a significant role in focusing on a synergy of application and critical thinking.

The policy expects that media education will become holistic and multidisciplinary. Inclusivity will be the buzz word and universities should promote multilingualism. Inclusive journalism & mass communication courses can promote diversity training and practice and foster gender equality. Multilingualism will pave the way for enhancing infrastructure to facilitate high-quality language journalism and regional media. Journalism and Mass Communication departments should encourage quality research that is culturally rooted and embraces plurality.

The Curriculum and Credit Framework 2022 for Semester Wise Four Year B.A/ B.Sc (Honours & Honours with Research) approved by University of Calcutta has made it compulsory for students to do one 3 credits Summer Internship at the end of the 2nd or 4th or 6th semester. This will be beneficial for students taking up Journalism at the undergraduate level as they will get some insight into the media industry. Those who go on to pursue research at the undergraduate level will be pursuing the Master's degree programme for one year. Those students who complete a three-year Bachelor's degree without research will be eligible for two year Master's course where it will be mandatory to complete a research project in the second year. The new regulations also open up the opportunity to take up PhD for those students who have completed four years of Bachelor's degree with research. A healthy blend of theory, application and research is expected to infuse new energy into media education.

Improvement in infrastructure, funding and upskilling of the faculty to bridge the digital divide will be the challenges that need to be addressed. An interdisciplinary approach to teaching and research will augur well for journalism & mass communication.

সংবাদপত্রে কার্টুনের রসবোধ আজ কোথায়!

ড. রাতুল দত্ত

কার্টুন। মনের মধ্যে জমে থাকা দায়বদ্ধতা থেকে এক সমাজ সচেতন শিল্পী যে শিল্পের জন্ম দেন। কমিকস স্ট্রিপ বা আজকের হাল্কা হাসির মিম নয়। জনগণেশের জনমানসে জমে থাকা এক প্রচন্ড কৌতুক মুক্তি পায় মাত্র একটি ছবিতে, কার্টুনিস্টের বলিষ্ঠ তুলির টানে। আর তাই এই এক প্ল্যাটফর্মে গা ঘেঁষাঘেষি করে বসতে পারেন পিসিয়েল, শৈল, রেবতীভূষণ, চন্ডী, অমল, শঙ্কর, আবু, কুট্টি, লক্ষ্মণ, মারিয়ো কিংবা গয়ার মত শিল্পীরা। একটাই সাধারণ পরিচয় — এঁরা সংবাদপত্রের কার্টুনিস্ট। এঁরা ব্যঙ্গচিত্রকর। অর্থাৎ বলা চলে, সংবাদপত্র এবং কার্টুন প্রায় হাত ধরাধরি করেই বেড়ে চলেছে, ভারতে কিংবা বিদেশে।

আসলে সত্য জিনিসটাই তো আপেক্ষিক। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিরও বদল ঘটে। যেমন, পণপ্রথা নিয়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কার্টুন করেছিলেন— "মেয়ের মা কাঁদে/ ছেলের বাবা পুঁটুলি বাঁধে"; তা আজ আর ছাপা হবে না। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করার রেওয়াজ থেকে 'মাসিক বসুমতি'-তে চঞ্চলকুমার বন্দোপাধ্যায় কার্টুন করেছিলেন — স্ত্রী হাই হিল পড়ে আপিস চলেছে আর স্বামী সন্তানকে ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছেন। আজকের দিনে এসব বিষয় অচল। এমনকী 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় প্রমথ সমাদ্দার স্বামীর মদ্যপান নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কার্টুন আঁকলেও আজকের দিনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে মদ্যপান আর দোষের নয় বলে বিষয়টি আর গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকী নিন্দুকেরা বলেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দুর্নীতি আজ এমন স্তরেই পৌঁছে গিয়েছে যে, সম্পাদকরাও দুর্নীতিকে কাটুনের বিষয় নির্বাচনে দ্বিধাগ্রস্ত।

একসময় ব্রিটেনের ঢঙে মুম্বই থেকে 'হিন্দি পাঞ্চ' পত্রিকায় কার্টুন ছাপা হলেও পূর্বাঞ্চলের পত্রপত্রিকার মধ্যে প্রথম কার্টুন ছাপে 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ১৮৭২ সালে। আর ঠিক এর পরের বছর কলকাতার হাটখোলা দত্ত বাড়ির প্রমথনাথ দত্ত ও গিরীন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বসন্তক' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল কার্টুন। পরবর্তীকালে যেহেতু বিডন স্ট্রিটের গরানহাটা এবং বটতলার কর্মকারদের হাতে সূক্ষ্ম হাতের কাজের ওপর সমাজ কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, সমসাময়িক পত্রিকার সম্পাদকরা অর্ডারিমাফিক কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র করিয়ে আনতেন এঁদের দিয়ে। দৈনিক পত্রিকায় কাঠের ব্লকে কার্টুন ছাপার শেষ নমুনা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় মন্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসন সংস্কার সম্পর্কিত কার্টুন।

গগনেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সংবাদপত্রে ভারতের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী। পিসিয়েল (Piciel) নামেই তিনি ছবি আঁকতেন। প্রথমে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের 'অ্যাডভান্স' পত্রিকা এবং তারপর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় স্টাফ কার্টুনিস্ট হিসাবে চাকরি পেয়েছিলেন পিসিয়েল। বলা চলে, দেশের প্রথম স্টাফ কার্টুনিস্ট তিনিই। তুলি নয়, নিব দিয়ে ছবি আঁকতেন। নিজের কাগজে 'খুড়ো' নামে এবং 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'শেয়াল পণ্ডিত' নাম দিয়ে কার্টুন রিপোর্ট করতেন তিনি। এমনকী, সিজার্স সিগারেটে এবং 'সিরোলিন রোশ' কাশির সিরাপে কার্টুন ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতের বিজ্ঞাপন জগতে প্রথম কার্টুনের ব্যবহার হল পিসিয়েলের হাত ধরেই। আবার হাওড়ার আন্দুল মৌড়িগ্রামের মানুষ শৈল চক্রবর্তী, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় তুলির টানে 'ডাকু' নামের কার্টুনটি তৈরি করলেও মেজাজের দিক থেকে নিজে ছিলেন পেন্টার। সংবাদপত্রে পশুপাখির কার্টুন এবং তাদের ছবিতে কোমল পেলবতা আনার ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভাশালী ছিলেন রেবতীভূষণ। রিপন কলেজের সংস্কৃত অনার্স। কিন্তু 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় দীর্ঘদিন কার্টুন করেছেন।

রেবতীভূষণ পাকাপাকি দিল্লি যাওয়ার মধ্যেই কার্টুনে কলকাতার সংবাদপত্রের হাল ধরলেন চণ্ডী লাহিড়ী। প্রথমে 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় দিনে ও 'লোকসেবক' পত্রিকায় রাতে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ঘুরে, ২৮ বছর আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। আবার সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের প্রেক্ষাপটে দেখলে পিসিয়েল-এর পর একমাত্র শক্তিশালী কার্টুনিস্ট শঙ্কর এবং লক্ষণ। স্বাধীনতার আগে, 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক পোঠান জোসেফ-এর ইচ্ছায় সেই সময়ের সমস্ত ভাইসরয় এবং ভারতের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কার্টুন করতেন শঙ্কর, একজন চাকুরীজীবী হিসাবেই। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে নিজে প্রকাশ করলেন 'শঙ্করস উইকলি'। এদিকে শঙ্কর যখন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ছত্রছায়ায় নিজেকে প্রসারিত করছেন, তখন লন্ডনে 'অবজারভার' এবং 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় কার্টুন আঁকছেন আবু আব্রাহাম। কর্মজীবন, 'বোম্বে ক্রনিকল'-এ শুরু। এরপর লন্ডন ঘুরে ভারতে এসে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'। দেশের একমাত্র কার্টুনিস্ট, যিনি রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। আবার পুরোদস্তুর বাঙালি না হয়েও বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে বিরাট ছাপ ফেলে রেখেছেন কুট্টি। পঞ্চাশের দশকে আনন্দবাজার গোষ্ঠী, স্টাফ হিসাবে। মালয়লম 'বিশ্বরূপম' পত্রিকা ঘুরে 'শঙ্করস উইকলি'তে কাজ করে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' হয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। একজন কার্টুনিস্ট যদি একটি সংবাদপত্রকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে, একটি পত্রিকাও একজন শিল্পীকে নিয়ে আসে অন্তরাল থেকে পাদপ্রদীপের আলোয়। পত্রিকা 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' এবং কার্টুনিস্ট রশিপুরম কৃষ্ণস্বামী লক্ষণ। তাঁর 'কমন ম্যান' চরিত্রে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বছরের পর বছর দর্পণের মতোই প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু কলমের আঁচড় নয়। রঙের গভীর জ্ঞান এবং ঝটিতি স্কেচ ছিল তাঁর আয়ত্তে।

প্রায় সব কার্টুনিস্টের জীবন ট্রাজেডিতে পূর্ণ। কারণ এখন কার্টুন ছাপতেই চিন্তিত হয় সম্পাদকরা। অন্যদিকে স্থায়ী কর্মী করতেও অনীহা। আবার রয়েছে রাজনৈতিক দলের রাজরোষ। তারিখ বদলের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক নান্দনিক একটি শিল্প কার্টুনের মৃত্যু ঘটে। অর্থহীন কার্টুন মনে করে নিউজপ্রিন্টের কাগজ সংরক্ষণেও অনীহা। সেদিনের সেই কার্টুনে কি আর মাতোয়ারা হবে সংবাদপত্রের পাঠককুল!

Bangladesh Film Festival 2023 in Kolkata: Celebrating Cinematic Excellence

Amit Kumar Mahali

The much-anticipated Bangladesh Film Festival 2023 recently took place in the cultural hub of Kolkata, India, celebrating the rich tapestry of Bangladeshi cinema. The event, held from 29th July to 31st, served as a platform to showcase the finest cinematic creations from Bangladesh, fostering cultural exchange and strengthening the ties between the two neighbouring countries.

The 5th Bangladesh Film Festival was organized by the Information and broadcasting ministry and Bangladesh deputy high commission in Kolkata, and inaugurated by Bangladesh's Information and broadcasting minister, Hasan Mahmud. West Bengal education minister Bratya Basu and Indian film director Goutam Ghose attended as honourable and special guests, respectively. Notable personalities like Ferdous Ahmed, Dilara Hanif Purnima, Aruna Biswas, Apu Biswas, Mamunuzzaman Mamun, and Goutam Saha from Bangladesh have also participated. Bangladeshi films, including "Hasina: A Daughter's Tale," "Gondi," "Birkonna Pritilata," "Lal Shari," "Guerrilla," "Damal," "Poran," "Gunin," "JK 1971," and others also screened.

The festival attracted cinephiles, filmmakers, and artists from both sides of the border, providing them with a unique opportunity to delve into the diverse world of Bangladeshi cinema. Organised by the collaboration between the Bangladesh Film Development Corporation and the West Bengal Film Centre, the festival aimed to promote cultural diplomacy and artistic camaraderie.

The festival featured a plethora of films across various genres, including fiction, documentaries, and shorts. Audiences were treated to a curated selection of cinematic gems, highlighting the Bangladeshi people's stories, struggles, and triumphs. The films not only offered an immersive experience for viewers but also showcased the profound storytelling and artistic brilliance of Bangladeshi filmmakers.

Beyond the film screenings, the festival included panel discussions, workshops, and masterclasses with eminent personalities from the Bangladeshi film industry. These interactive sessions provided aspiring filmmakers and enthusiasts with valuable insights into the art and craft of cinema, further enhancing the exchange of ideas between the two nations.

In conclusion, the Bangladesh Film Festival 2023 in Kolkata was a resounding success, capturing the hearts and minds of attendees and fostering a deeper appreciation for the art of storytelling through cinema.

Behind bylines: Resilience of women in Journalism

Adeeba Ayub

Over the span of India's documented history, the position of women has seen several transformations. The role of women in media organizations is growing, with a rising number of female journalists. We live in a world where female journalists receive as much appreciation as they have to face challenges. They often encounter gender biasness, lack of new opportunities or underrepresentation of women in decision making Despite the challenges they face, these women have enriched media with diverse perspectives and groundbreaking stories. Suchita Dalal, Anjana Om Kashyap, and Smita Prakash exemplify the capabilities of women in journalism.

Netflix recent launched series Scoop directed by Hansal Mehta, dives headlong inside the everyday struggle of female journalist.In the race of chasing byline for front page Jagruti Pathak ends up giving her all. Based on journalist Jigna Vora's 2019 memoir 'Behind Bars in Byculla : My Days in Prison'.The series depicts how, when a woman climbs the ladder of success, numerous questions are raised about her. Mehta delved into the back – scratching world through the story of Jagruti Pathak. The show does make a statement about the biasness, perspective of people and threatened they feel seeing a rising women. With the dreadful voyage of equality, female journalists tend to peer up, despite the barriers that society provides to them. Behind every headline is a hidden story of the unrelenting war that women in journalism have waged, they still manages to diversify media with their outlook.

পটের উপাদান আজ কী অস্তিত্বের সংকটে!

হাবিবা রহমান

পটুয়ারা তুলির টানে সাজিয়ে তুলেছেন বাংলার ঐতিহ্যের জানা – অজানা বিভিন্ন অধ্যায়। কখনও ফুটিয়ে তুলেছেন ঐতিহাসিক রুদ্ধশ্বাস কাহিনী আবার কখনও পৌরাণিক অলৌকিক কাহিনীর নানান ছবি। সুর ও স্বরের মেলবন্ধনে গড়ে তোলা ছবিগুলিকে প্রাণ দিয়েছেন ' পটে ' । পটুয়ারা প্রকৃতির রং এবং তুলির টানে তৈরী করে কল্পবাস্তবের এক অভূতপূর্ব যুগলবন্দী। যেখানে সামাজিক, ধর্মীয়, লৌকিক – অলৌকিক কোনও বিষয়ই বাদ যায় না। কিন্তু উপাদান ক্রমশই দুর্লভ হয়ে ওঠায় বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী লোক - সংস্কৃতি আজ হয়তো বিলুপ্তির পথে। আসলে তুলির রঙেই টান পড়লে পটচিত্র আর আঁকবে কে? আর তাই হয়তো, লক্ষ্মীবাঈ আর আসর বসায় না,শ্যামাকান্তের বীরত্বে আজ ঘুঁন ধরেছে, শের খাঁ আর বাঘের লড়াই কল্পনাতেই বন্দী, বিবি সুন্দরীও আজ পর্দার আড়ালে, শিব দুর্গার বিয়েও তাই গাজনেতেই ফেরে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় পটুয়াদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম মেদিনপুরের পিংলার নয়া গ্রামে পটুয়াদের নামে আস্ত একটা পাড়া রয়েছে, যার নাম " পটচিত্র গ্রাম "। পটুয়ারা পট চিত্রায়নে বৈচিত্র্যপূর্ণ রঙ ব্যাবহার করেন। যেমন, আলামাটি বা হলুদ গাছ থেকে হলুদ রঙ, শিমপাতা বা হিঞ্চে শাকের রস ,বেলপাতা শোকানো গুঁড়ো থেকে সবুজ রঙ, কালো জাম বা পাকা পুঁই মিছরি থেকে বেগুনি রঙ, অপরাজিতা ফুল বা তুঁত থেকে নীল রঙ,খড়িমাটির থেকে সাদা রঙ, চুন বা আলামাটির সঙ্গে খয়ের মিশিয়ে খয়েরী রঙ,পোড়ামাটি বা লাল গিরিমাটি পাকা তেলাকুচা , সজনে গাছের পাতা বেটে লাল রঙ, ভুষোকালি এবং গাব গাছের শিকড় পুড়িয়েও কালো রঙ ইত্যাদি। এমনকি পটে রঙ বেশিদিন স্থায়ী রাখতে পটুয়ারা ব্যাবহার করেন বেল, গঁদ, শিরিশ বা নিমের আঠা, সিদ্ধ করা তেঁতুলবিচি এবং ডিমের কুসুমও। এছাড়াও রঙতুলি তৈরিতে ব্যাবহৃত হতো, বেজি কিংবা ছাগলের লোম। পটবৈচিত্র্যের চৌকো পট অপেক্ষা দীঘায়িত লম্বা গোটানো পট ছিলো বেশি চমকপ্রদ। পূর্বে পটুয়ারা গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে পটের উপর চিত্রের দ্বারা রচিত গল্পগাথাগুলি সুর করে পড়তেন এবং ওই গোটানো ক্যানভাস একটু একটু খুলে তার উপর আঁকা চিত্রগুলির প্রদর্শন করতেন, শোনাতেন ঐতিহ্যের ইতিকথা।তবে বর্তমানে এই পেশার প্রতি একটা অনীহার দেখা মিলছে। অতীতে গ্রামেগঞ্জে গান শুনিয়ে চিত্র প্রদর্শন করার পরিবর্তে তারা দুমুঠো চাল পেতেন। কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে। মানুষের রুচিও পাল্টেছে। পাল্টেছে বিনোদনের সংজ্ঞাও। আসলে পটের যে মূল উপাদান এই যে রঙ, তা আর সহজে মিলছে না। পটকে আঁকড়ে বাঁচা পটুয়া। আজ তারাই জীবন – জীবিকার টানাপোড়েনে তুলি ভুলছে। পড়ে আছে শুধু পট, পটুয়া আর তাদের গান। তবে মিলবে কী উপাদানের নতুন দিশা! উত্তরের অপেক্ষায়।

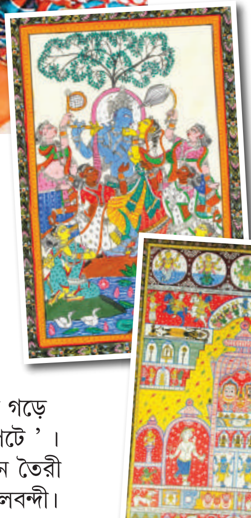

Byomkesh Bakshi: An endless enduring fascination

Moumita Guha

At 1331 in the Bengali calendar, when the city was plagued by illegal drug trafficking, leaving the police baffled and unable to crack the case that had perplexed them. In the midst of crime and chaos gripping Bengal, Sharadindu Bandyopadhyay created one of his most remarkable literary work - Byomkesh Bakshi. From the literary realm to the silver screen, the tales of Byomkesh Bakshi have consistently enthralled audiences over the years.

The first film adaptation of Byomkesh Bakshi saw its theatrical release with legendary filmmaker Satyajit Ray's Chiriyakhana (1976) casting stalwart like Uttam Kumar as Byomkesh Bakshi. The film paved the way for the forthcoming adaptations of the Byomkesh stories on screen. It got associated with renowned film directors, Rituparno Ghosh (Satyanweshi, 2013), Dibakar Banerjee (Detective Byomkesh Bakshy, 2015) while Arindam Sil, Anjan Dutt doing a series of films. Eminent actors like Abir Chatterjee, Jisshu Sengupta, Sujoy Ghosh and others also became the part of Byomkesh franchise. The resonance with the 1930s to 1960s India, alongside the detailed set designs, costumes and language adds a layer of authenticity to the films. Films such as Anjan Dutt's "Byomkesh O Agnibaan" vividly depicted the societal chaos in historical setting of Calcutta while "Har Har Byomkesh" skilfully weaved dramatic nuances and elements of romanticism into the narrative. In 1993, Byomkesh Bakshi appeared on Doordarshan's National channel under Basu Chatterjee's direction. Rajit Kapoor (as Byomkesh Bakshi), K.K. Raina (as Ajit Bandopadhyay), and Sukanya Kulkarni (as Satyabati) brought alive his new persona through their acting. Apart from that there are other adaptations of Byomkesh at various times on television. With the remarkable rise of OTT platforms chronicles a new era in storytelling, revolutionizing the way narratives are shared and experienced by audiences worldwide.

Deviation from the original narratives Ray made Byomkesh a bachelor and Ajit as a married man. Though the film is widely celebrated, its lack of details, continuity issues, and occasional descent of characters into caricature, failed to do justice to the story. Arindam Sil's "Har Har Byomkesh" based on Banhi Patanga saw a drastic changes in the narrative. While the original whodunit was set in Patna, Sil made a departure by setting the tone in the old Benaras. While on the other hands, Dibakar Banerjee's "Detective Byomkesh Bakshy!" starring Sushant Singh Rajput was not the adaptation from the Bandyopadhyay's book. With the settings of 1940s Calcutta, the film has mix of history and noir but the charisma of Bakshi is somewhere lost. Banerjee's Byomkesh while unveiling the crime that surrounds him became the part of it too. While many actors have taken up the challenge of portraying Byomkesh Bakshi on-screen, some have truly captivated the hearts of audiences. With the announcement of Birsa Dasgupta's Byomkesh venture "Byomkesh O Durgo Rahasya", starring Dev (Byomkesh Bakshi), Rukmini Maitra (Satyabati) and Ambarish Bhattacharya (Ajit), it is about time whether the audience will embrace the actor as their new Satyanweshi.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কলকাতার ঐতিহ্যশালী ভবন

দেবপ্রিয়া কুন্ডু ও উপাসনা অধিকারী

লর্ড ক্যানিংয়ের আমলে তৈরি হওয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাংলার কৌলিন্য, ভারতের গর্ব। ইতিহাস ঘাটলে খোঁজ পাওয়া যায় ইউরোপীয়-ধাঁচের তৈরি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও তখন কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হতো না অর্থাৎ এটি কোনো উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র ছিল না, এটি ছিল মূলত পরীক্ষা গ্রহণকারী কেন্দ্র। এখানে ১৯০৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে প্রথম শিক্ষাদানের পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না, অনেক অতিপরিচিত ঐতিহ্যবাহী ভবন রয়েছে যা ওতপ্রোতভাবে এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপের সাথেই যুক্ত। শুরুতে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজকে পড়ানোর জন্য অনুমোদন প্রদান করে থাকত এবং এখানে শুধুমাত্র এন্ট্রান্স ও বিএ পরীক্ষা পরিচালনা হত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ভীষণভাবেই সম্পৃক্ত ১৮১৭ সালে তৈরি হওয়া সেদিনের প্রেসিডেন্সি কলেজ যা আজকের বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮২৪ সালে তৈরি হওয়া সংস্কৃত কলেজ যা

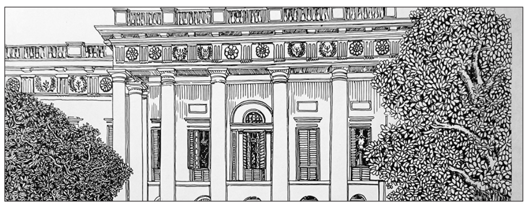

বর্তমানের সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৩৫ সালে তৈরি হওয়া কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং ১৮৮০ সালে তৈরি হওয়া বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই প্রতিটি কলেজই ছিল সেদিনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা প্রথম দিকের কলেজগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৭০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মহাকরণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যালয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য এনে সুসম্পর্ক তৈরির উদ্দেশ্যে নির্মিত হলেও কলেজ স্ট্রিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউস তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এখানে ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের মিটিং হতো। ১৮১৩ সালে কলকাতার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের সভার স্থান হিসাবে টাউন হল নির্মিত হলেও ১৮৫৭ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা হত টাউন হলেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের

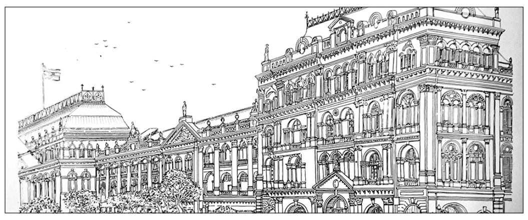

প্রথমদিকের সেনেট সভাগুলি ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে হত। ১৮৭২- ১৮৭৩ সালে তৈরি সেনেট হলে সেনেট সভা, উপাচার্যের চেম্বার, রেজিস্ট্রারের কার্যালয় ছিল। এটি তৈরির পর টাউন হল থেকে পরীক্ষা পদ্ধতি সেনেট হলে তুলে আনা হয়। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, যেটি ১৯১২ সালে নির্মিত হয়েছিল সেখানে এখন উপাচার্যের চেম্বার, একাডেমিক বিষয়ের সহ উপাচার্যের চেম্বার, রেজিস্ট্রার এবং পরীক্ষা নিয়ামক সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসগুলি অবস্থিত। ১৯২৬ সালে তৈরি আশুতোষ বিল্ডিংয়ে বর্তমানে ভাষা, সাহিত্য ও বাণিজ্য বিভাগের পঠন পাঠন হয়। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সেন্তেনারি ভবনে লাইব্রেরী, আশুতোষ মিউজিয়াম, অডিটোরিয়াম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অফিস রয়েছে। এছাড়াও সহ উপাচার্য (অর্থ), কলেজের পরিদর্শক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের অফিসও এখানে অবস্থিত। এছাড়াও ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখার্জি ৯২,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এখানে বর্তমানে ফলিত রসায়ন,অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স বিভাগ অবস্থান করছে। বালিগঞ্জের নবনির্মিত কমপ্লেক্সটি ১৯৬৪ সালে ব্যবহারের জন্য খোলা হয়েছিল। এতগুলি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ভবনের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড় সম্পর্ক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে যেন আরও সমৃদ্ধ করছে।

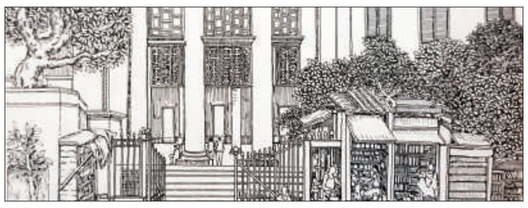

রবিকবির কলমে

প্রথম পাতার পর...

এটিই বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিম সংগীত।সালটা ১৯৩৭, ২৪ জানুয়ারি। প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের এই নতুনত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলি উৎসাহে মেতে ওঠে। করতালি ও উচ্ছ্বাসে রাস্তার দু'ধারে লোক জড়ো হয়। ব্যান্ড পার্টির বাজনার তালে কুচকাওয়াজের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে চলে। সকলে সমস্বরে কাহারবা তালে গেয়ে ওঠে — চলো যাই, চলো যাই গানটি। পরের মাসে ১৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সাক্ষী হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং অন্যান্যরা। সেই প্রথমবার কবি ঠিক করেন বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দেবেন। ভাষণে তিনি বলেন, "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তা লাভে গৌরবান্বিত হবে সেই আশার সঙ্কেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি, তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন ক'রে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি"। এই বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লেখা গানগুলির বিষয়ও ফুটে উঠেছিল তাঁর কথায়। স্বদেশ পর্যায়ের দু'টি গানের মধ্য দিয়েই তিনি তরুণসমাজকে স্বাদেশিকতায় ব্রতী হতে বলেন। কবি বলেন, "তোমরা যে সকল তরুণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হোতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৌরব-দিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামী কালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ"। আর এভাবেই তাঁর রচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সংগীত এক অনন্যতা লাভ করে।

কলকাতার কলেজস্ট্রিটে কয়েক কোটির সাংবাদিকের মূর্তি!

অদিতি হীরা

মধ্য কলকাতার ব্যস্ততম মহাত্মা গান্ধী রোড এবং বিধানসারণীর সংযোগস্থল, কলেজস্ট্রিট। আর এখানে আপাত আড়ালে রয়েছে কলকাতায়, ভারতীয় কোন সাংবাদিকের প্রথম মূর্তি। আজকের বইপাড়ায়, দোকানের ভীড়ে, প্লাস্টিকের আচ্ছাদনে, পথচলতি মানুষের দৃষ্টি থেকে প্রায় আড়ালেই চলে গেছে কয়েক কোটি টাকা অর্থমূল্যের এই মূর্তি। কয়েক কোটি কারণ, ১৮৯৪ সালে যখন ভিক্টোরিয়া যুগের সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পালের মূর্তিটি বসানো হয়েছিল, তখনকার মূল্যে খরচ ছিল ১৪ হাজার কোটি টাকা। ১৮৫৩, বড়বাজারের কলাকার স্ট্রিটে মধুসূদন রায়ের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হল হিন্দু প্যাট্রিয়ট। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই পত্রিকার জন্য লিখতে আরম্ভ করেন কৃষ্ণদাস পাল। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সংবাদপত্রের জন্যে উদীয়মান সাংবাদিক কৃষ্ণদাসের লেখনী ধারণ এবং অচিরেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ (নভেম্বর ১৮৬১) এবং আমৃত্যু (প্রয়াত হন- ১৮৮৪ এর ২৪শে জুলাই) প্রায় তেইশ বছর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সম্পাদনা করেন ।

জীবৎকাল মাত্র ৪৫ বছরের হলেও বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও বিগত

শতকের নানা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম মিউনিসিপ্যালিটির তিনি 'কমিশনার' (১৮৬৩) এবং 'জাস্টিস অব পিস' নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যও মনোনীত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাসের বহুমুখী কাজকর্মের জন্যে কুইন ভিক্টোরিয়ার 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লিতে আয়োজিত দরবারে লর্ড লিটন কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত হন (১ জুন ১৮৭৭)। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জুলাই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে কৃষ্ণদাসের কলকাতায় পরলোক গমন করেন। ১৮৯৪ সালের ৬ই মার্চ এক বিরাট অনুষ্ঠান করে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড এলগিন।

Senate House

Cont. P1

esteemed Victorian architect Walter B. Graville, was a sight to behold. Its grand facade, adorned with Corinthian pillars, exudede the grandeur reminiscent of ancient Greek temples. The formal inauguration took place on university's convocation day. The Seante House served multiple purposes, housing the meetings of the Senate and hosting the official chamber of the Vice-Chancellor, the Registrar's office, examination halls, and lecture rooms. Its historical significance reached beyond academics; on December 27, 1934, it hosted the inaugural edition of the all Bengal Music Conference. In 1937, an art gallery and museum, named Asutosh Museum of Indian Art, were added in the Western Hall of the Senate House, enriching the university's post-graduate studies in Ancient Indian History and Culture.

Enhancement of moral

Cont. P1

he was also the chief justice of Bengal back then. Gooroo Dass was born in 1844, and as a bright student from the beginning, he received education from some of the greatest institutions in Calcutta at that time, such as the Oriental Seminary, the Hare school, the Scottish Church College and the University of Calcutta. Initially he was interested in mathematics. He completed his masters in 1866, and started teaching as a professor at the Scottish Church College. Later he grew interest in the judiciary and in 1877 he obtained Doctorate in law. Sir Gooroo Das also believed that the objective of education doesn't only revolve around passing examinations, but it is to shape the students into a useful member of the society. This side of his temperament first shone through his address to the students in university convocation and later through his books such as - A Few Thoughts on Education (1904), The Education Problem in India (1914) etc.

পালিতের বসতবাটি, বাগানবাড়ি আজকের দুই সায়েন্স কলেজ

শিল্পা নাথ

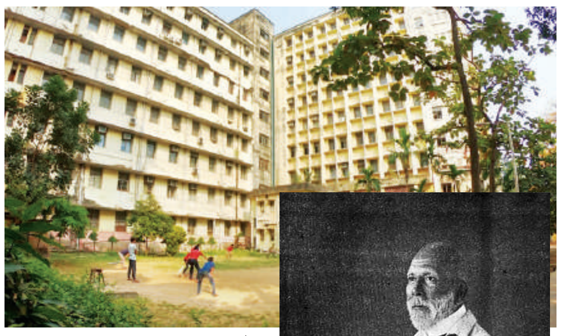

সালটা ১৯১২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও পালি সহ নানা বিষয় পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। সেইসময় উপাচার্য পদে থাকা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেশীয় দাতাদের কাছে আবেদন রাখেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে, নিজের বসতবাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানচর্চার স্বার্থে দান করেছিলেন, আইনজীবী তারকনাথ পালিত। যার অনস্বীকার্য অবদানের জন্য আজও স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সায়েন্স কলেজ। আজকের তারকনাথ পালিত শিক্ষা প্রাঙ্গণ।

শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, তার পঠন-পাঠন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শতবর্ষেরও বেশি আগে এক বাঙালি নিজের বাগানবাড়ী ও বসতবাটিটুকুও দান করে দিয়েছেন এবং নিজে কপর্দকশূন্য হয়েও প্রবল অর্থকষ্টে চলে যাচ্ছেন, ভাবা যায়! সেদিনের তারকনাথ পালিতের পার্শিবাগানের বাগানবাড়ি আজকের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ এবং তার নিজের ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বসতবটি আজকের বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ। তিনি ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে দুই কিস্তিতে যে অর্থ ও সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন, তার অর্থমূল্য ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। এই টাকাতেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগের দুটি অধ্যাপক পদ তৈরি এবং বৃত্তি বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও ১৯২৫ সাল পর্যন্ত পদার্থ ও রসায়ন বিভাগের সহ অধ্যাপকদের বেতনও পালিত তহবিল থেকে আসতো।

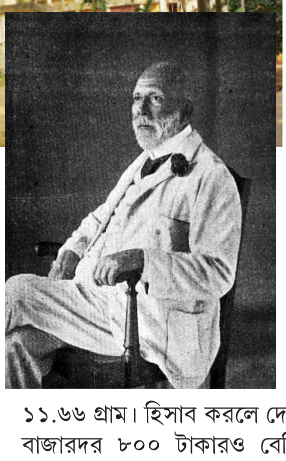

বিজ্ঞান কলেজের ক্যাম্পাস তৈরির ক্ষেত্রে রাসবিহারী ঘোষেরও অবদান কিছু কম ছিল না। রাসবিহারী ঘোষ ১৯১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন প্রায় ১০ লক্ষ টাকা, যে টাকায় চারটি পূর্ণ অধ্যাপক পদ তৈরি হয়েছিল- পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ফলিতগণিত এবং উদ্ভিদবিদ্যা-র। এছাড়াও গবেষকদের বৃত্তি প্রদানের সুযোগও ছিল। যার পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৯০০ টাকা।

১৯১২ সালে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন "১" টাকার মুদ্রা চালু করেন। যাতে রুপোর পরিমাণ ছিল ১১.৬৬ গ্রাম। হিসাব করলে দেখা যাবে, সেই রুপোর বর্তমান বাজারদর ৮০০ টাকারও বেশি। অর্থাৎ আজকের বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়কে পালিত ও ঘোষে-র মোট দানের পরিমাণ কয়েকশো কোটির কম নয়। শোনা যায় ১৯১৭-১৮ সালে বিজ্ঞান কলেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ হয়েছিল ২,৩৯,৪৭৩ টাকা। রাসবিহারী ও তারকানাথের দান থেকে সুদ বাবদ এসেছিল ১,৩৬,২৫৬ টাকা।

তাঁকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে পালিতের নামাঙ্কিত একটি চেয়ার রয়েছে, যেটির নাম "পালিত চেয়ার অফ ফিজিক্স"। সি. ভি. রামান, দেবেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাথ সাহার মতো বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনায় অমূল্য ২৩১

শ্রুতি দাস, শ্রেয়া দাস

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের হেগেলের দার্শনিক মতবাদ (১৯১৪) ও রামদাস খানের KANT'S CENTRAL CONCEPT (১৯২০) এর মত বিরল, গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ গুলি একসময় প্রকাশিত হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব প্রকাশনা থেকে। কিংবা ড. অসীমা চ্যাটার্জির ভারতীয় বনৌসধীর ৬টি খন্ড। অধ্যাপক আর এন বসুর পরিবেশ অথবা বুদ্ধ কোষের ৬টি খন্ড। এরকমই ২৩১ টি অমূল্য গ্রন্থের সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ। বই বিক্রির ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য গৌণ বরং ভালো বই ছাপিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে এই অমূল্য বই গুলির সংরক্ষণ বইগুলির প্রকাশের অন্যতম ভাবনা। বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, গোপনীয় কাগজপত্র ছাপানোর পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক, গ্রন্থ, এবং জার্নাল প্রকাশ করে আসছে। কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপকদের ও বিভিন্ন শিক্ষাবিদের দ্বারা লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়। এশিয়ার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নালগুলির মধ্যে অন্যতম "দি ক্যালকাটা রিভিউ জার্নাল" প্রকাশিত হয়। ৪৮, হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস রয়েছে। সম্প্রতি অফসেট এবং DTP সহ নতুন প্রিন্টিং মেশিন মাধ্যমে প্রেসের আধুনিকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১৮৯৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রশ্নপত্রের কপি প্রভৃতি রয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী পঞ্চম তলায়। কলেজস্ট্রিট ক্যাম্পাসের রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সেলস কাউন্টার। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত বই,জার্নাল ইত্যাদি সুলভ মূল্যে যে কেউ কিনতে পারেন। হেগেলের দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও বিরাটত্ব নিয়ে লিখেছেন নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,১৯১৪ সালে। এগুলো দর্শন কিভাবে সমাজনীতি, রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে এবং বিশেষ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (ডায়লেক্টিকাল মেটারিয়ালিজম) এর প্রভাব সেই বইতে উল্লেখ করেছেন। বইটির বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো বহু জানা অজানা বাংলা পারিভাষিক শব্দ ও তার ইংরেজির তালিকা রয়েছে, শুধু যার জন্যই বইটি সংগ্রহ করে রাখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বৌদ্ধ-পালি-সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ও বিষয়ের বহু দুর্লভ বই রয়েছে এই প্রকাশনায়। রয়েছে পূর্ববঙ্গের কবিগান এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সিংহের লেখা দুটি অমূল্য বই। দাম মাত্র ৩০০ বা ১০০ টাকা। কিন্তু কবিগানের গ্রন্থে লেখক যেভাবে বিশিষ্ট কবিয়াল, কবিগান, তাদের ছন্দের বিশ্লেষণ ও ছবি তুলে ধরেছেন তা আজও গবেষকদের আকর গ্রন্থ। রয়েছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ৬টি রচনা গ্রন্থ, যুথিকা মিত্রের Medical Science in Ancient India, জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তীর Solutions of Differential Equation, ডি সি সরকার এর Religion and Culture of the Jain, অধ্যাপক ঋত্বিকা বিশ্বাসের গণতান্ত্রিক উদারনীতির প্রসার বিশেষ বই Redical Face of Democratic Liberalism, জিতেন্দ্র নাথ বসুর Romance of Indian Journalism ইত্যাদি নানা বিষয়ের খুব ভালো কিছু বই। সবই বিক্রি হয় কলেজস্ট্রিটের বিশ্ববিদ্যালয় সেলস কাউন্টার থেকে, বইগুলি ছাপা থাকলে। তাহলে আর দেরি কেন! স্বল্পমূল্যে দুর্লভ বই সংগ্রহে চলে আসুন কলেজস্ট্রিট ক্যাম্পাসের সেলস কাউন্টারে।

কলকাতার বহু পত্রপত্রিকা আজ ইতিহাসের পাতায়

সৌরপ্রভ চ্যাটার্জী

'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'-র এক সাংবাদিক কলকাতার নতুন নাম দিয়েছিলেন 'পত্রিকানগরী'! অনেকেরই অবলুপ্তি ঘটেছে, বদলে গিয়েছে ঠিকানা, চরিত্র এমনকি মালিকানাও।

১৭৮০ সালের জানুয়ারিতে, এই শহরেরই ৬৭, রাধাবাজার স্ট্রিট থেকে জেমস অগাস্টাস হিকির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সংবাদপত্র 'হিকি'স বেঙ্গল গেজেট'। আরও কয়েকবছর পর, ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৪৫, চোরবাগান স্ট্রিটে কলকাতার প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন, নাম দেন 'বাঙ্গালা গেজেটি প্রেস'। সেখান থেকে ওই বছরই প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি' সংবাদপত্র। ফলে গঙ্গাকিশোরই প্রথম বাঙালি সাংবাদিক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক। তবে দুর্ভাগ্যবশত 'বাঙ্গাল গেজেটি'-র কোনও কপি এখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় সমাচার দর্পণই বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্রের মর্যাদা পেয়েছে। উত্তর কলকাতার ১০১, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর বসতবাড়ির লাগোয়া 'প্রভাকর প্রেস' থেকে ১৮৩১ সালে এক সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩৯ সালে এটি আত্মপ্রকাশ করে বাংলার প্রথম দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' হিসাবে। ১৮৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে কলাকার স্ট্রিটে স্থাপিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। প্রেস যথাক্রমে ১৩৬ রাধাবাজার স্ট্রিট এবং ভবানীপুরে স্থানান্তরিত হলে সম্পাদনার ভার নেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হরিশচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস পাল হন সম্পাদক, তাঁর ১০৮ ও ১০৭, বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের বাড়িতেই গড়ে ওঠে পেট্রিয়ট প্রেস, যার বর্তমান ঠিকানা ৬৩এ ও ৬৩বি, তারক প্রামাণিক রোড।

সমসাময়িক 'সোমপ্রকাশ' যাত্রা শুরু করে ১৮৫৮ সালে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কতৃর্ক আমহার্স্ট স্ট্রিটের ১, সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন থেকে প্রকাশিত হতো এই সাপ্তাহিকী। তাঁর মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য সোমপ্রকাশ প্রেস ও পত্রিকা কিনে নেন এবং ১৬, শিবনারায়ণ দাস লেনে অফিস স্থানান্তরিত হয়। এর কয়েকটি বাড়ি পরেই, ২৩ শিবনারায়ণ দাস লেন থেকে ১৯০৪ সালে অগ্নিযুগের সান্ধ্য দৈনিক 'সন্ধ্যা' প্রকাশ করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই গলি থেকে বড় রাস্তায় উঠলে চোখে পড়ে ২০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের (অধুনা বিধান সরণি) বাড়ি, যেখানে আগে ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' কার্যালয়। এছাড়াও ছিল 'কান্তিক প্রেস', প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজ পত্র' এখান থেকেই প্রকাশিত হতো। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ২১০/১/৩ নম্বর বাড়ি থেকে প্রকাশিত হতো 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা। পরে ১২০/২ আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে এপিসি রোড) সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে অফিস স্থানান্তরিত হয়। পার্শ্ববর্তী রাস্তার নাম এখন রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। এর অদূরে ২/১, ক্রীক রো-তে (বর্তমানে ৪/১, গঙ্গারাম পালিত লেন) রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের তত্ত্বাবধানে এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের সম্পাদনায় ১৯০৬ সালে গড়ে ওঠে বন্দেমাতরম প্রেস এবং পত্রিকা। যা সম্পাদনাকালে রাজদ্রোহের অপরাধে অরবিন্দ প্রথম গ্রেপ্তার হন। ১৬৬, বৌবাজার স্ট্রিটে ছিল 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির', প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরবর্তীকালে 'দৈনিক বসুমতী'-র কার্যালয়। বৌবাজার স্ট্রিটেরই ৯৩এ নম্বর বাড়িতে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'বিজলী'। নজরুলের সম্পাদনায় ১৯২২ সালে ৩২, কলেজ স্ট্রিটের ঠিকানায় প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু', যদিও কিছুকাল পরে তা পাশের ৭, প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে উঠে যায়। ব্রিটিশ-বিরোধী 'আনন্দময়ীর আগমনে' লিখে গ্রেপ্তার হন নজরুল। অন্যদিকে, যশোর থেকে আত্মপ্রকাশ করে, প্রথমে বৌবাজার এবং ১৮৭৪ সালে বাগবাজারের ২ ও ১৩, আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে যথাক্রমে স্থাপিত হয় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র স্থায়ী কার্যালয় ও ছাপাখানা। ভার্নাকুলার অ্যাক্টকে ফাঁকি দিতে সম্পাদক শিশির কুমার একে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেন এবং কলকাতার গণ্ডি পেরিয়ে কটক, রাঁচি, এলাহাবাদেও বিস্তৃত হয়। ১৯৩৭ সালে একই বাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর' দৈনিক। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস বন্ধ হয়ে গেলে অমৃতবাজার ও যুগান্তর স্থানান্তরিত হয় ৪১, লোয়ার সার্কুলার অর্থাৎ জগদীশ চন্দ্র বোস রোডে।

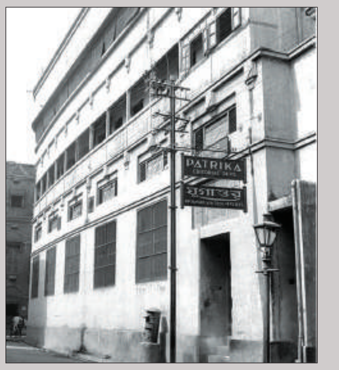

বিজ্ঞানের দুই চিরসাধকের প্রয়াণ

অদিতি তালুকদার

ভারতের পরমাণু এবং শক্তি গবেষণা ক্ষেত্রে নক্ষত্র পতন। প্রয়াত বাঙালি পরমাণু বিজ্ঞানী 'পদ্মভূষণ' বিকাশ সিংহ(৭৮)। প্রেসিডেন্সি এবং পরবর্তীকালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাঙালি দীর্ঘদিন সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়র ফিজিক্স-এর অধিকর্তা ছিলেন। হোমি জাহাঙ্গির ভাবা অধ্যাপক পদেও ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে রাজ্যসরকার বঙ্গবিভূষণ এবং রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করেন। অন্যদিকে ২০ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ৯২ বছর বয়সের 'যুবক' স্যার সমর বাগচী। ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মশালায় যিনি পরিচয় দিতেন 'I am a 90 year old boy' বলে। গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথভক্ত সমরবাবু ছিলেন কর্মদ্যোগী। অফুরন্ত উদ্যম ছিল তাঁর। শেষ বয়সেও বিভিন্ন সেমিনার, সভা ও জমায়েতে সশরীরে যোগদান করেছেন। জীবনের শেষ কয়েকদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তাঁর প্রয়াণে বিজ্ঞান ও পরিবেশ মহল, দুই-ই হারালো এক বিরাট মাপের মানুষকে। বিজ্ঞান নেশা। প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্যানধারণা। এই আন্দোলনে তাঁরা ছিলেন একেবারে প্রথমে। গত কয়েক দশকে এরকম বড়ো মাপের বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মী বাংলা পায়নি।

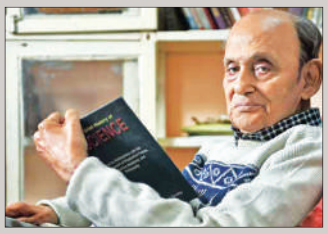

প্রয়াত আলোক সাংবাদিক অলোক গুহ

বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক অলোক গুহ(৮৭)র জীবনাবসান হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ নিজের বাসভবনেই তিনি প্রয়াত হন। ১৯৫৭ সালের সর্বভারতীয় চিত্র সাংবাদিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া অলোক গুহ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৫ সালের প্রাক্তনী এবং পরবর্তীকালে এই বিভাগেরই অতিথি অধ্যাপক। চিত্র সাংবাদিকতার সূত্রপাত 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে গিয়ে 'এক্সেলেন্ট' সম্মান অর্জন করে কলকাতা ফিরে আসেন এবং তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম রেজিস্ট্রিকৃত সর্বভারতীয় সংবাদচিত্র সংস্থা 'ল্যান্ড অ্যান্ড লাইফ ফটো নিউজ এজেন্সি'। কলকাতার রাজপথের বহু ঐতিহাসিক গণ আন্দোলনের ছবি ফ্রেমবন্দি করেছেন তিনি। ১৯৭৩ সালে তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম সর্বভারতীয় পেশাগত চিত্র সাংবাদিকতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ফ্রেমবন্দি কিছু মুহূর্ত

১ ছবি : প্রসূন মণ্ডল

২ ছবি : রণদীপ বাগ

৩ ছবি : সৌভিক দে

৪ ছবি : রাহুল ব্যানার্জি

১. ওই দেখা যায় ভুলভুলাইয়ার মাঝে।
২. আসছে পুজো, সাজছে মা।
৩. কলকাতার অকল্যান্ড সার্কাস গার্ডেনের (বর্তমানে ইডেন গার্ডেন পার্ক) অন্যতম আকর্ষণ বার্মিজ প্যাগোডা। ১৮৫৬ সালে বারো জন বার্মিজ শিল্পী তিনমাস ধরে জুড়ে দাঁড় করান এই প্যাগোডাটিকে।
৪. ইন্দোনেশিয়ার বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ইয়েলো ব্যাকড্ চ্যাটারিং লোরি।

৫. পড়ন্ত বিকেলে ঘরে ফেরার গান।
৬. জিম করবেট জাতীয় উদ্যানে।
৭. শারদোৎসবের প্রস্তুতি।
৮. আলোকিত এই নগরের কোনায় কোনায় কী অন্ধকার!

৫ ছবি : সাক্ষী গাঁতাইত

ছবি :অনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬

৭ ছবি : শিল্পা নাথ

৮ ছবি : অর্কদীপ মাখাল

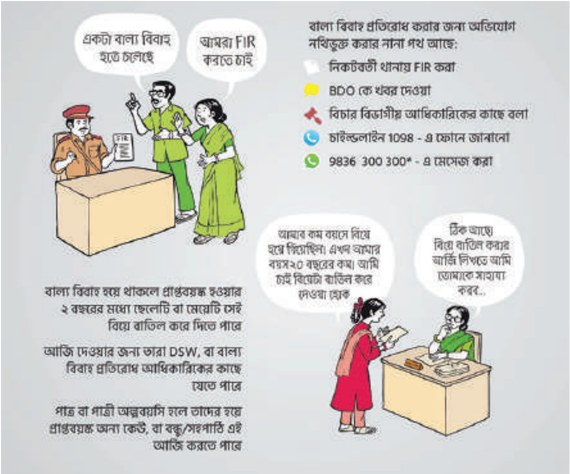

বাল্যবিবাহ। শিশুদের যৌন অত্যাচার। অনলাইন জালিয়াতি। সবকটিই মানবাধিকার লঙ্ঘন সূচক অপরাধ। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের প্রচার।

চিত্রসৌজন্য : পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন।

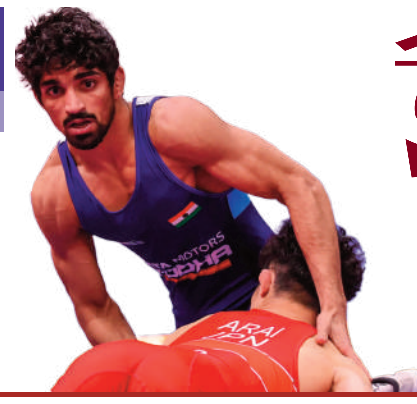

ইউনিক্যাল
UNICAL

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Aman Sehrawat- Gold Medal winner for India under men's 57ks freestyle Category in Asian Wrestling Championships 2023 held in April

Indian women's team won gold in women's unified team event in volleyball in 2023 Special Olympic held in Berlin

Parul Chaudhary -Gold Medal winner for India in her first major championship in 3000m steeplechase at the Asian Athletics Championships 2023 held in July

Women sports needs more push from sponsor

Jui Mitra

Women sports needs more push from sponsor. Behind the breath taking and fascinating competitions and record-breaking moments, there exists a persistent issue that undermines the principles of fairness and equality: the striking distinctiveness in sports sponsorship between male and female Athletes. If it is Olympic, Wimbledon, world cup men's sports are still dominating sponsorship in destiny. Women still face considerable challenges. Despite the extraordinary achievements and meticulous performance of female athletes, notable progress in promoting gender equality, female athletes often find themselves overshadowed, dimmed and underfunded when it comes to sponsorship compared to their male counterparts. Women's sports have chronically received significantly less financial backing from sponsors than men's sports. However there is drastic shift of public perception of women sports and fund is increasing. Media coverage plays a crucial role in securing sponsorships in this regard. Woefully, men's sports grab the attention of big house media and women's sports receive significantly less airtime compared to their counterparts . Consequently, female athletes are struggling to gain visibility which makes it harder to attract potential sponsors and intercede remunerative deals.

2023 has become significant in culminating sponsorship of biggest brand for women. Puma has sealed sponsorship deal with Harmanpreet Kaur, a leading Indian women cricket. Puma's rival Adidas has sealed deal with Loitongbam Ashalata Devi, a prominent Indian women footballer. While the celebration of their achievements on the field makes the audience thrilled and excited, it's also crucial to remember acknowledging the persisting disparity in sports sponsorship.

হিজাবে বিশ্বমঞ্চের রেফারি

অদিতি হীরা

প্যালেস্টাইনের হেবা

২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পুরুষদের বিশ্বকাপ ফুটবলে নারী রেফারিদের অভিষেক। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবারও ফুটবল বিশ্বকাপে দৃষ্টান্ত তৈরী হল রেফারিতে নারীর অধিষ্টান নিয়ে। মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনার ইতিহাস গড়ে তুলতে চলেছেন ৩৪ বছর বয়সি হেবা সাদিয়া। তিনি প্রথম প্যালেস্তেনীয় যিনি পুরুষ বা মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপে রেফারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন যা এর আগে করতে পারেননি দেশটির কোন পুরুষও। ২৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এবারের মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপ, সেখানেই বিভিন্ন ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব সামলাতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় নবম মহিলা ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনার জন্য প্রথম ফিলিস্তিনি নারী রেফারি হিসেবে হেবা সাদিয়াকে মনোনীত করেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।

সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরুর পরে, ২০১২ সালে হেবা চলে যান মালয়েশিয়ায়। ভাগ্য বদলের শুরু সেখান থেকেই। চার বছর পর জাতিসংঘের পুনর্বাসন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে পরিবারসহ পাড়ি দেন সুইডেনে। তবে ভুলে যাননি নিজের পরিচয়। হিজাব পরে, অদম্য মনোবল নিয়ে রেফারি হিসেবে কাজ শুরু করেন নারী ও পুরুষ লিগে- এরপরের গল্পটা শুধুই এগিয়ে যাওয়ার। ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে রেফারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে এই বিস্ময় নারীকে। এএফসি কাপ, এশিয়ান কাপ, বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব ও টোকিও অলিম্পিকের পর এবার ম্যাচ পরিচালনা করেছেন ২০২৩-এর মহিলা বিশ্বকাপে।

নিজের স্বপ্ন পূরণের পথে পোড়াতে হয়েছে বহু কাঠখড়। কখনও রাস্তায়, কখনও পার্কিং এরিয়াতে প্র্যাকটিস করে প্রতিনিয়ত নিজের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে গেছেন হেবা । লড়াইটা ছিল তাঁর একার। নারী রেফারি বিষয়টিকে আজও অসম ক্রীড়া জগতের অনেকেই সজভাবে মেনে নিতে পারেন না। তবে কোনদিন পিছুপা হননি তিনি, কঠিন সময়ের সাথী ছিল তাঁর মনোবল। একটু একটু করে পূর্ণতা পাচ্ছে তাঁর কেরিয়ার।

দেশের গর্ব

২০১৮-র পর ২০২৩। এশিয়া কাপ জিতল ভারত। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে। ১৭ আগস্ট, ২০২৩। এই নিয়ে ৮ বার ট্রফি জিতল ভারত।

১০৬ বছরে অ্যাটলেটিক্সে সোনা! ২৮ জুন,২০২৩ এমন বিরলতম ঘটনার সাক্ষী রইল দেরাদুন স্টেডিয়াম। ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড় এবং শট পাটে স্বর্ণপদক জিতলেন রামবাঈ। ন্যাশনাল ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে।

চৌষট্টি খোপের কিংবদন্তির কাছে তারুণ্যের পরাজয় ঘটলেও দেশের হৃদয় জিতেনিলেন ১৮ বছরের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ২৪ আগস্ট ২০২৩। দাবা বিশ্বকাপে রানার্স হলেন তিনি।

খেলার নাম মজা

অজয় বসু

সব সুস্থ মানুষই খেলাধুলা ভালোবাসে। খেলাধুলার দিকে মানুষের টান সহজাত। জন্মের পরই শিশু তার মায়ের কোলে শুয়ে থাকতে থাকতে হাত-পা নেড়ে তার প্রাণের প্রকাশ ঘটায়। শিশুর হাত-পা নাড়া এক ধরনের খেলা। এতে যেমন তার প্রাণশক্তির অভিব্যক্তির লক্ষণ ধরা পড়ে তেমনি ওই নড়াচড়ার মধ্যে ধরা থাকে ছন্দোবদ্ধ জীবনের এক একটি ধারা। মানুষের জীবনে ছন্দ আছে, সুর আছে। সুর ছন্দ মিলিয়েই জীবন সহজ ও সুন্দর। সহজ জীবনধারা যদি কোথায়ও হোঁচট খায় তাহলেই মানুষের চলার পথ অস্বাভাবিক হয়ে উঠে।

শিশু নিজের ছন্দেই নিজেকে নাচায়। নাচতে নাচতে বাড়তে বাড়তে তার কাঠামো যখন আর একটু কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে ছন্দ বৈচিত্র্যের সন্ধানে মায়ের কোল ছেড়ে খেলার মাঠের দিকে পা বাড়ায়। মাঠমুখী হতে তাকে কেউ না বল্লেও আপনার খেয়ালেই সে ঝোঁকে সেদিকে। কী একটা দুর্বার আকর্ষণ তার হাত ধরে টানে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সবাই অনুভব করতে পারে বলেই বলতে হয় যে ক্রীড়া প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত।এই সহজাত প্রবৃত্তি যত্নে লালিত পালিত হয় একটু বয়স বাড়লে। যখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষ বুঝতে পারে যে খেলায় থাকে অনেক মজা এবং ছন্দও। মজা কতরকমের। হারজিত ঘিরে মজা, কিছু করতে পারার সান্ত্বনায় মজা, মজা তো সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মনের মত করে মিলতে মিশতে পারায়। আর ছন্দ থাকে বড় বড় পা মেলে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে, সমস্ত শক্তি সংহত করে থাকে ঝাঁপ দেবার রীতিতে। নিজের সমস্ত প্রাণশক্তিকে ছড়িয়েছিটিয়ে মজাটুকু লুটানিতে পারার মধ্যেই থাকে যতো আনন্দ। হাত পা গুটিয়ে ধরে বসে থাকলে কী আর সে আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়?

খেলার আনন্দের পরিধিই বা কতো বিস্তৃত। যত দিন যায় ততোই আনন্দ সায়রে টুপ টুপ ডুব দেওয়ার অবকাশ। কতজনের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ আসে খেলতে খেলতে। শত্রু মিত্র সবাকার সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়ার সুবিধা পাওয়া যায়। তবে শত্রু তো কথার কথায়ই। বিপক্ষে যারা খেলে মুহুর্তের জন্যে তাদের শত্রু বলে মনে হলেও আসলে তারা খেলার সাথীই। তারা না থাকলে খেলা জমে কী করে ? কি করেই বা হারজিতের প্রশ্ন ঘিরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায় ? তথাকথিত শত্রুপক্ষ এবং স্বপক্ষের সকলের সঙ্গে সখ্যতার বন্ধনে জড়িয়ে পড়াই হল খেলাধুলার লক্ষ্য। খেলোয়াড়দের আদর্শ। এই আদর্শে যে পৌঁছে যেতে পারে খেলোড়ার নাম তারই সার্থক এবং সার্থক খেলোড়ার যে সে যথার্থ মানুষও বটে। যেহেতু জীবনের লক্ষ্য, সমাজ,সংসারের আদর্শ সকলের সঙ্গে মৈত্রী, প্রীতির ডোরে জড়িয়ে থাকা। জীবনে পরম লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায় খেলার মাঠে। খেলতে খেলতেই। তাই খেলাধুলাকে পরম অর্থবহ বলে মনেও করা হয়। মনে করা হয় খেলা হেলাফেলার জিনিস নয়।

ধুলা শব্দটি খেলার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে বটে। তবু খেলার আসরে ধুলা নিয়ে মাখামাখি করার কারণ নেই। যে আসর আনন্দ ও মজার উৎস, যেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা তাদের শারীরিক সামর্থ সম্ভাবনার পরিচয় উজাড় করে দেয় এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সম্প্রীতির বন্ধনকে নিবিড় করে তুলতে চায়, চায় শুভেচ্ছা ও প্রীতি বিনিময় করতে। আজকাল গোটা পৃথিবী জুড়ে কতরকমের আন্তজাতিক খেলাধুলার আসর বসছে। দক্ষ খেলোয়াড় হয়ে উঠতে পারলে সেই সব অনুষ্ঠান কেন্দ্রে হাজির থাকার সুযোগও পাওয়া যায়। মস্ত সুযোগ। দেশবিদেশ ঘোরা, অজানা মানুষের চেনা ও জানর সুযোগ। যত জানা ততোই শিক্ষা পাওয়া। এ কী কম কথা না, কম মজা। এত মজা যেখানে ছড়িয়ে আছে সেখানে না যাওয়াই চরম মুর্খামি। সাধ করে যারা এই বোকামির প্রশ্রয় দেয় তারা হারায় অনেক কিছু। কী যে হারায় তা বুঝি তারা নিজেরাও টের পায় না। ঈশ্বর করুন,এমন মূর্খামি যেন কেউ না করে।

১৯৮৩ সালে সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি বিখ্যাত জার্নাল, The Journalist। আজকের দিনেও ভীষণ প্রাসঙ্গিক এই লেখাটি সেখান থেকে সম্পাদনা করে পুনঃমুদ্রিত। লেখক বাংলা ক্রীড়াধারাভাষ্যের 'উত্তম কুমার'। বাংলায় অনর্গল উচ্চারণে মেতে থাকতো গোটা ইডেন গার্ডেন্স। সেই সঙ্গে তিনি বিভাগের প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক।

প্রধান উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. পীযূষকান্তি পাণিগ্রাহী। সম্পাদকীয় পরামর্শদাতা : ড. রাতুল দত্ত। পৃষ্ঠাসজ্জা ও অলংকরণ : অমিত কুমার মহলী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ১১ বিটি রোড, কলিকাতা ৭০০০৫৬ থেকে মুদ্রিত।